সুভদ্রা

শিশুর পরিচালক,

সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী, সতী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫০।১ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য এক টাকা।
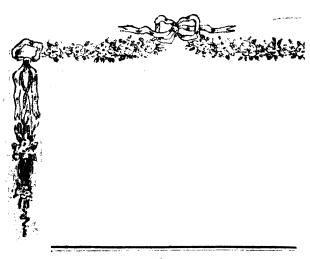
কলিকাতা।

৬৫।১ নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট,

"শিশু প্রেস" হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম অধ্যায়।
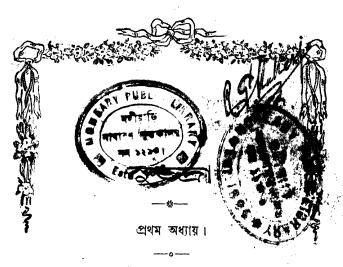
সাগরপুলিনে।

সন্ধ্যা সমাগতা প্রায়। সূর্য্যদেব কিরণমালা আহরণ করিয়া অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন। তাঁহার লোহিত বর্ণে সুনীল আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে; সমুদ্রের নীল জলে সে রক্তিমাভা প্রতিফলিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছে।

এমন সময়ে সাগরতীরস্থিত পর্ব্বতের পাদমূলে দাঁড়াইয়া এক কিশোরী প্রকৃতির মনোরম শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মস্তকের উপর অসীম আকাশ—সম্মুখে অপার সুনীল সাগর—

পার্শ্বে কুলুকুলুনাদিনী গিরিনদী—পশ্চাতে রৈবতক পর্ব্বত। ইহারই পাদমূলে কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

একে এমন মনোমদ স্থান; তাহাতে আবার সান্ধ্য প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—কিশোরী যতই দেখিতেছেন, ততই মুগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার মনপ্রাণ যেন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার দেহযষ্টি ধ্যাননিরতা যোগিনীর ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সান্ধ্য-সমীরণে কিশোরীর দোলায়মান কেশকলাপ আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখাইতেছে—আবার বসনাঞ্চলে যেন কত বিদ্যুতের খেলা খেলিতেছে। তাহাতেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গিতেছে না।

উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র, তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া কিশোরীর অলক্ত-রঞ্জিত পদযুগল ধৌত করিয়া দিতেছে, ইহাতেও তাঁহার

ভ্রূক্ষেপ নাই। কিশোরীর প্রাণ-শূন্য দেহ যেন বাহ্য প্রকৃতির কিছুই দেখিতেছেনা, কিছুই শুনিতেছে না।

সহসা এক যুবতী আসিয়া কিশোরীর পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা হইলেন। যুবতী, কিশোরীকে অন্বেষণ করিতেই সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিমুগ্ধ ভাব দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইলেন। তিরস্কার করিতে আসিয়া, নিজেই তিরস্কৃত হইলেন। তিনি কিশোরীকে আর সম্বোধন করিতে সাহস পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, যুবতীর চমক ভাঙ্গিল, সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া, কিশোরীকে ডাকিলেন —"সুভদ্রা!" "সুভদ্রা!!"

যুবতীর স্নেহবিজড়িত, বীণাবিনিন্দিত স্বর কিশোরীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। তাঁহার ধ্যানও ভাঙ্গিল না।

তখন যুবতী সুভদ্রার চিবুক ধারণপূর্ব্বক

বলিলেন—"সুভদ্রা, সন্ধ্যা হইয়াছে, এভাবে আর কতক্ষণ এখানে থাকিবে ?"

গাঢ় নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে সহসা জাগরিত করিলে, সে যেমন কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকে, সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তেমনই হইল। তিনি যেন এ ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যুবতী আবার ডাকিলেন। এবার অতি আদরে সুভদ্রার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং স্নেহভরে বলিলেন—"এস দিদি-মণি আমার—প্রাণসখী আমার, সন্ধ্যা হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।"

তখন কিশোরীর ধ্যান ভাঙ্গিল। দেখিলেন—বাল্য-জীবন-সঙ্গিনী বৌদিদি সত্যভামা, তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়াছেন। অমনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—

"বৌদিদি, বৌদিদি, দেখ দেখ, অপার সমুদ্রের সহিত অসীম আকাশের সন্মিলনে কি সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহারা যেন

পরস্পরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত, উভয়েই যেন কি এক মহান্ উদ্দেশ্যে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছে। দূরে—বহু দূরে যাইয়া যেন তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়াছে। সাগরের সহিত মিলিত হইয়া যেন অসীম আকাশ সসীম হইয়াছে—আর তাহাদের ধরাধরির আগ্রহ নাই, ধরিবার জন্য ছুটাছুটি নাই, সেখানে তাহারা ধীর, স্থির, প্রশান্ত।”

সত্যভামা এই কথায় যোগ দিয়া বলিলেন,—“ঠিক বলিয়াছ দিদিমণি আমার, যে যাহাকে চাহে, সে তাহাকে পাইলে এই প্রকার ধীর, স্থির, শান্তভাবই ধারণ করিয়া থাকে। এই দেখ না, তোমাকে না পাইয়া কত উদ্বেগ হইয়াছিল—কত স্থানে খুঁজিয়াছি—কত ছুটাছুটি করিয়াছি—প্রাণে কত অশান্তি আসিয়াছিল! কিন্তু যেমন পাইয়াছি, অমনিই সকল যাতনা দূর হইয়াছে। প্রাণে যেন কত শান্তি আসিয়াছে।” এই কথা বলিতে বলিতে সত্যভামা সুভদ্রাকে

সস্নেহে বাহুপাশে বেষ্টন করিলেন, কতই আদর মমতা জানাইলেন। পরক্ষণে বলিলেন —"এস দিদিমণি আমার, সূর্য্যদেব অস্তমিত প্রায়, চল এখন বাড়ী যাই।"

সুভদ্রা এক পদও নড়িলেন না—তাঁহার প্রাণ যেন এখনও প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া পান নাই। বিনীত ভাবে বলিলেন—

"না বৌদিদি, এখনও সূর্য্যদেব অস্তমিত হন নাই। একটুকু অপেক্ষা কর, প্রাণ ভরিয়া এই মনোরম দৃশ্য আর একটুকু দেখিয়া যাই।" এই বলিয়া সুভদ্রা সত্যভামার হস্ত ধরিলেন এবং আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—

"ঐ দেখ বৌদিদি, সূর্য্যদেব অস্তাচলে আরোহণপূর্ব্বক সন্ধ্যা সমাগমে কি শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! সন্ধ্যার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ ছিল— সন্ধ্যার অভাবে প্রাণে কত জ্বালা ছিল। এক্ষণে সন্ধ্যাকে পাইয়া, সকল জ্বালা—সকল

যন্ত্রণা দূর হইয়াছে; নিজে শান্তি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকেও স্নিগ্ধ কিরণে শীতল করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ এক্ষণে আনন্দে উৎফুল্ল—স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ।"

"দেখিয়াছি, দেখিয়াছি; সূর্য্যদেবের এইরূপ লীলা খেলা বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। আমাদের মিলনের সুখ পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং সূর্য্যদেব আমাকে আর তোমার মত সুখী করিতে পারিবেন না। তুমি এখন মিলনের ব্যাখ্যা রাখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, শীঘ্র বাড়ী চল। নতুবা এখনই তোমার দাদা আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

এই বলিয়া সত্যভামা সুভদ্রার হস্ত ধারণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু সুভদ্রা বাধা দিয়া বলিলেন,—

"দেখ দেখ বৌদিদি, আর একটি রমণীয় দৃশ্য দেখ। ঐ গিরিনদী কত চঞ্চল গতিতে পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। তাহার প্রাণে যেন কত জ্বালা, কত

যন্ত্রণা। কোথাও যেন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইবামাত্রেই যেন, তাহার সে জ্বালা—সে যন্ত্রণা ঘুচিয়াছে, আর সে চাঞ্চল্য নাই, সে ছুটাছুটি নাই। তাহার প্রাণে যেন কত সুখ, কত শান্তি। সে যেন এই শান্তি-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেছে না। তাই একই স্থানে আবর্ত্তাকারে বারম্বার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"
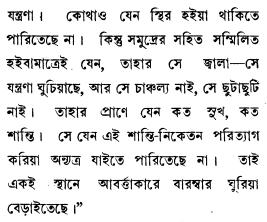
এই কথা বলিয়াই সুভদ্রা, বৌদিদির স্কন্ধোপরি মস্তক রাখিয়া, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া পুনরায় ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—

"হাঁ, বৌদিদি, মিলনে কি এতই সুখ, এতই শান্তি ?"

"এখন বাড়ী চল দিদিমণি আমার, তোমার দাদাকে যাইয়া বলি—তোমার ভগিনী মিলনের জন্য পাগল হইয়াছে শীঘ্র তাহাকে একটি মনের মানুষ আনিয়া দাও। তখন

নিজেই বুঝিবে, মিলনে কত সুখ, কত শান্তি। তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।”

সত্যভামার কথায়, সুভদ্রা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—“একি কথা বৌদিদি ? আমি প্রাকৃতিক মিলনের কথাই বলিয়াছি ; তাহাতে আর দোষ কি ? তবে তুমি দাদাকে এইরূপ ভাবের কথা বলিবে কেন ?”

“যদি কোন দোষই না থাকে, তবে তোমার দাদা শুনিবেন, তাহাতেই বা দোষ কি ?”—এই বলিয়া সত্যভামা কটাক্ষে সুভদ্রার প্রতি চাহিলেন।”

“আমি যাহা বলিয়াছি, দাদার নিকট যদি ঠিক সেই কথাগুলি বল, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু তুমি যে তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাও ?” এই কথা বলিয়া সুভদ্রা কাতরনয়নে সত্যভামার দিকে চাহিয়া

রহিলেন। সে চাহনির অর্থ যেন সত্যভামার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা।

রঙ্গময়ী সত্যভামার নিকট সে প্রার্থনা আদৃত হইল না। তিনি রঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"না, আমি অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিব না। তুমি যাহা বলিয়াছ, ঠিক সেই কথাগুলিই তোমার দাদাকে বলিব। তাহাতেই তোমার দাদা বুঝিবেন—মিলনের জন্য পাগল না হইলে, কেহ এমন মিলনের গুণ কীর্ত্তন করে না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, একথা শুনিবামাত্রই তোমার দাদা এই মিলন-রোগের উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন, আমরাও শীঘ্রই দ্বারকাতে মিলন-উৎসবে মত্ত হইব, তুমিও মিলন-সুখ-সাগরে অবগাহন করিবে।"

সত্যভামার কথা শেষ না হইতেই তাঁহাদের পশ্চাৎ দিক্ হইতে কেহ বলিলেন—

"কাহার সঙ্গে মিলন হইতেছে সত্যভামা?"

"প্রাণনাথের অভাবে তাঁহার প্রাণের ভগ্নী সুভদ্রার সঙ্গে।"

সত্যভামা এই কথা বলিয়াই পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বুঝিতে পারিয়া, সুভদ্রা নীরবে পলাইলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, সুভদ্রা চলিয়া গিয়াছেন। তখন রঙ্গ করিয়া সত্যভামাকে বলিলেন—"কৈ সত্যভামা, সুভদ্রা কোথায়?"

"এই যে আমরা দুই জনে মিলিয়াই রহিয়াছি।" এই বলিয়া সত্যভামা সুভদ্রাকে পার্শ্বস্থিতা মনে করিয়া, তাহার গলদেশে হস্ত স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। লজ্জিতা সত্যভামা বলিলেন—"পোড়ারমুখী পলালি কোথায়?"

মাধব এই কথা লইয়া কিছুকাল সত্যভামার সহিত রঙ্গ করিলেন, কিন্তু মানিনীর মানের

ভয়ে বেশী ঘাঁটাইলেন না। সত্যভামাও সুভদ্রাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"বৃথা চেষ্টা, সে এতক্ষণে উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা করিতেছে। চল, আমরাও সেখানে যাই।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরমন্থর গমনে নানা বিষয়ের আলাপ করিতে করিতে উদ্যান-বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সত্যভামা, আজ এক নূতন সংবাদ দিতেছি। আমার প্রাণসখা অর্জ্জুন তীর্থদর্শন উপলক্ষে দ্বারাবতীর নিকটে আসিয়াছেন। আমি আগামী কল্য তাঁহাকে আনিতে যাইব, তোমরা তাঁহার অভ্যর্থনার সকল আয়োজন করিও। কাল তাঁহাকে এখানেই আনিব, পরে দ্বারকায় তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ বন্দোবস্ত করিব। তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেই আমি এখানে আসিয়াছি।"

অর্জ্জুনের আগমন সংবাদ শুনিয়া সত্যভামার প্রাণে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিবারাত্রি যাঁহার প্রশংসা শুনিয়া থাকেন, যাঁহাকে পাইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে ভুলিয়া যান, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল হইল।

অর্জ্জুনের প্রসঙ্গ শেষ হইলেই সত্যভামা অতি গম্ভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, "সুভদ্রার বয়স হইয়াছে, তাহার বিবাহের কোন চেষ্টা দেখা উচিত নয় কি? না ভগ্নীকে চিরকুমারী ব্রত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছ?"

শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "কাহার বিবাহের চেষ্টা করিব সত্যভামা? সুভদ্রার বিবাহের বয়স হইয়াছে সত্য; কিন্তু ও বয়সে স্ত্রীলোকের মনে যে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সুভদ্রাতে তাহার কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি? সে যে উদাসিনী, সে কি কখনও স্বামীর

মর্য্যাদা বুঝিবে, না স্বামীর যত্ন জানিবে, সে কি স্বামীকে ভালবাসিতে পারিবে? সে যে সৃষ্টি-ছাড়া মেয়ে।"

"সে দোষ কি তাহার, না তোমার? তুমি বালিকা হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছ, তাহাতে সে আত্মসুখ ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মন-প্রাণ সে ভগবান্‌রূপী দাদার চরণে সমর্পণ করিয়াছে—দাদাই তাহার যথা, দাদাই তাহার সর্ব্বস্ব। যে দাদার মনস্তুষ্টির জন্য সকল করিতে পারে—দাদাকে এত ভাল-বাসিতে, এত যত্ন করিতে পারে, সে কি স্বামীকে ভালবাসিতে, স্বামীকে আদর যত্ন করিতে পারিবে না? তবে তাহার উপযুক্ত স্বামী হওয়া চাই।"

এই বলিয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিলেন, "ভগ্নীর বিবাহের কথা শুনিয়াই যে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ! ভগ্নীরূপা

শিষ্যাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতে বুঝি প্রাণ চাহিতেছে না ?”

“তাহা নয় সত্যভামা, তাহা নয়। সুভদ্রা যে আমার কত আদরের, কত যত্নের ধন তাহা ত জান ? সেই সরলা বালিকার কথা মনে হইলে, আমি আত্মহারা হইয়া যাই। তাহাকে কত আদরে পালন করিয়াছি, কত যত্নে শিক্ষা দিয়াছি! সেই সুশিক্ষার ফলে সুভদ্রার হৃদয়ে সাংসারিক কালিমা বিদূরিত হইয়া ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে; আমার আশঙ্কা হইতেছে—সেই পবিত্র হৃদয়ে ভোগবাসনা আর প্রবেশ করিতে পারিবে না।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার অন্যমনস্ক হইলেন। সত্যভামা ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “যেমন গুরু, শিষ্যা ত তেমনই হইবে ?”

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—“কেন ? তাহার গুরুর যিনি গুরু, সেই শ্রীমতী সত্যভামা কি

তাঁহার প্রাণসখীকে দিবারাত্রি নিকটে রাখিয়া নূতন কিছু শিক্ষা দিতে পারিবেন না ?"
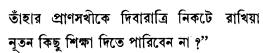
সত্যভামা প্রণয়-গর্ব্ব-দৃপ্ত হইয়া বলিলেন—"দেখিও পারে কি না—আগে তুমি বর আনিয়া দাও।"

শ্রীকৃষ্ণও উৎসাহের সহিত বলিলেন—"কালই আমি বর আনিতে যাইব।"

"তবে কি অর্জ্জুনকেই সুভদ্রার বর মনোনীত করিয়াছ ?"

সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিস্মিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আদর করিয়া বলিলেন—"বিস্ময়ের কারণ কি সত্যভামা ? অর্জ্জুনের মত শ্রেষ্ঠতম বর আর সমগ্র ভারতে মিলিবে কি ? জগতে অর্জ্জুন অদ্বিতীয় বীর। তাঁহাকে ভগ্নী সম্প্রদান করিতে পারিলে নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিব। যখন নিয়তি তাঁহাকে যথা সময়ে মিলাইয়াছেন, তখন প্রাণে আশা জাগিয়াছে,

কিন্তু ভগবান্ সে আশা পূর্ণ করিবেন কি? আমার সখা অর্জ্জুন ব্রহ্মচারী, ভগ্নী সুভদ্রাও যোগিনী, ইহাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা আছে কি?" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ করুণ-নয়নে সত্যভামার মুখের দিকে চাহিলেন।

সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন—"আছে,—আছে,—আছে,! নিশ্চয়ই মিলাব! সেই ব্রহ্ম-চারীর সঙ্গে যোগিনীকে নিশ্চয় মিলাব।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা রৈবতকের উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুভদ্রা পূর্ব্বেই আসিয়া-ছিলেন; এখন কৃষ্ণ ও সত্যভামা আসিতেছেন দেখিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন-কার মত আর দাদাকে কি সত্যভামাকে মুখ দেখাইলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—※—

রৈবতক।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারাবতীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। সুন্দর অট্টালিকা, নয়নাভিরাম উদ্যান, স্বচ্ছতোয়া সরোবর, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রভৃতিতে নব রাজধানী যেন অমরাবতীর সৌন্দর্য্যকেও পরাভব করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তথায় যাদবযাদবীগণসহ পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন।

দ্বারাবতী অতি সুরক্ষিতা নগরী।— তিন দিকে সমুদ্র, সম্মুখভাগে অত্যুচ্চ রৈবতক

পর্ব্বত—প্রাচীরের ন্যায় একদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিক্রম না করিলে স্থলপথে দ্বারাবতীতে প্রবেশ করিবার অন্য উপায় নাই। যে সকল গিরিসঙ্কট দিয়া প্রবেশ পথ রক্ষিত হইয়াছে, বাহির হইতে কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। রক্ষকগণ পর্ব্বতের উপরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করে। মধ্যে মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গনির্ম্মাণে শত্রু-গণের প্রবেশ রুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল দুর্গ অতিক্রম করিলে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে দ্বারাবতী নগরী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে এক পথ দ্বারাবতী নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শতমুখী গঙ্গার মত শতভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। অপর এক পথ পর্ব্বতগাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক উপত্যকার মধ্য দিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতের মূলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

পর্ব্বতের গাত্রস্থিত পথিপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের

প্রমোদবন,—নানা তরুলতায় ও পুষ্পপত্রে সুশোভিত রহিয়াছে। প্রমোদবনের এক প্রান্তে গৃহপালিত পশুগণ শ্যাম-শষ্পাচ্ছাদিত ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে। আর এক পার্শ্বে ময়ূর, চন্দনা প্রভৃতি পক্ষিগণ দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে। কোথাও বা কোকিল, ময়না প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া মধুরস্বরে শ্রোতার কর্ণ জুড়াইতেছে।

মধ্যভাগে বিচিত্র সরোবর। নিম্নস্থিত ফোয়ারা হইতে সলিল উত্থিত হইয়া সরোবরটি পরিপূর্ণ করিতেছে। রাজহংস, কলহংসী, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সরোবরের জলে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকে। কুমুদ, কহ্লার, রক্তোৎপল, নীলোৎপল প্রভৃতি জলজ পত্রপুষ্পে সরোবরটি চিরশোভিত।

সরোবরের তীরে মনোরম মন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগ বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত; অভ্যন্তরের শোভা আরও মনোরম। দেখিলে নয়ন জুড়ায়,

প্রাণে অতুল আনন্দ ঢালিয়া দেয়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ভবন—প্রিয়তমা সত্যভামার শান্তিনিকেতন। সত্যভামা রৈবতকে আসিয়া এই গৃহেই বাস করেন। এখানে তাঁহার প্রিয়সখী সুভদ্রারও থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

সমুদ্র-স্নাত-বায়ু এখানকার গ্রীষ্মকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। শীত, গ্রীষ্ম সমভাবে অবস্থিতি করায়, বোধ হয় যেন এখানে চিরবসন্ত বিরাজ-মান। বিভিন্ন ঋতুর ফুলফল এখানে নিয়ত জন্মিয়া থাকে। এইরূপ সুখের স্থান ভারতে অতি বিরল।

সত্যভামা, তাঁহার প্রিয়সখী সুভদ্রাসহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করেন। কারণ এই স্থানটি সুভদ্রার অতি প্রিয়। সুভদ্রা প্রকৃতিদেবীর পালিতা কন্যা। স্বাভাবিক সামান্য সৌন্দর্য্যেও তাঁহার প্রাণে অতুল আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি যে দিকে চাহেন, সেইদিকেই প্রকৃতির নিত্য নূতন মধুর লীলা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া

থাকেন। তিনি কখনও কোকিলের কুহুস্বর শুনিয়া স্বয়ং কুহুস্বরে সকলকে মুগ্ধ করেন, কখন কুরঙ্গিণীর সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করেন, কখন বা অসীম আকাশ, অপার সমুদ্র দেখিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতঃ আত্মাভিমান ভুলিয়া যান। কখন নবীন নীরদে, সুনীল সাগরে, শ্যামল তরুতে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া অনুভব করিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন।

সুভদ্রা প্রতিদিন রত্নবেদীস্থ রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি ব্রজের বেশে, বনফুলে সাজাইয়া, অপার আনন্দ অনুভব করেন। তাহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও তাঁহাদের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। আর সত্যভামা সুভদ্রার মুখে কৃষ্ণগুণ শুনিয়া আত্মসুখে বিভোর হন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ান। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই ভদ্রার উপাস্য—কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তিতে মুগ্ধ—আর বলরাম ভক্তিডোরে বাঁধা।

সত্যভামার এই মন্দিরের পার্শ্বেই সমুদ্র-তীর। পূর্ব্বাধ্যায়ে সেই সমুদ্রপুলিনেই আমরা সত্যভামা ও সুভদ্রাকে দেখিয়াছি।

রৈবতক যাদবগণের পবিত্র তীর্থ। যাদবী-গণ এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অধিষ্ঠিত দেবদেবীর অর্চ্চনা উপলক্ষে পর্ব্বত পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। ব্রত ও পার্ব্বণ উপলক্ষে এখানে আমোদ আহ্লাদ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

—※—
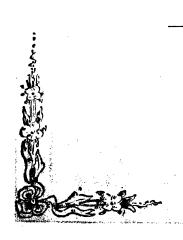
রৈবতকে রুক্মিণী।

আজ রৈবতকের উদ্যান বাটীতে আনন্দের সীমা নাই। শত শত দাসদাসী উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছে। সত্যভামা এবং সুভদ্রা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এক স্থান শত বার সাজাইতেছেন, শতবার ভাঙ্গিতেছেন, তবু যেন তাঁহাদের মনের মত হইতেছে না। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত না হইতেই গৃহ, বাগান, তোরণ প্রভৃতি কারুকার্য্যখচিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল।

সুভদ্রা আজ বহুযত্ন করিয়া সত্যভামাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। সত্যভামাও মনে প্রাণে সুভদ্রাকে বিচিত্র বসন-ভূষণে সাজাইতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন—"একেই ত এ ভুবনমোহন রূপ, তদুপরি এত সাজসজ্জা, ইহাতেও কি ব্রহ্মচারীর মন ভুলিবে না ?" মনে মনে কৃষ্ণ-উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছেন—"ঠাকুর, তোমার ইঙ্গিতে এ কাজে হাত দিয়াছি, দেখিও যেন লজ্জা না পাই।"

উভয়ের সাজসজ্জা শেষ হইয়াছে। সত্যভামা দর্পণে মুখ দেখিতেছেন। সকল অবয়বের অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি নিপুণভাবে পরীক্ষা করিতেছেন। সুভদ্রা হাসিয়া বলিলেন—"না বৌদিদি, আমি কোন অংশে কোন ত্রুটী রাখি নাই। দাদা তোমাকে যে বেশে দেখিতে ভাল বাসেন, আমি ঠিক সেই বেশেই তোমাকে সাজাইয়াছি। এ সজ্জা দাদার মনস্তুষ্টির জন্য—তোমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে।"

"আর তোমার এই সাজসজ্জা কাহার মনস্তুষ্টির জন্য সুভদ্রা?" এই কথা বলিয়া সত্যভামা কুটিলকটাক্ষে সুভদ্রার দিকে চাহিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

"ইহা আমার আরাধ্য দেবদেবীর মনস্তুষ্টির জন্য। দেবদেবীর সস্নেহ অনুরোধে, এই উৎসবের দিনে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিয়াছি এবং রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছি। আমার সাজসজ্জা দেখিয়া যদি তোমরা সুখী হও বৌদিদি, তবে আমি সাজিব না কেন? আমি ত তোমাদের সেবিকা, তোমাদিগকে সুখী করিতে পারিলেই আমার জীবন সফল মনে করি। দাদা আমার আরাধ্য দেবতা, তুমি আরাধ্যা দেবী। তোমরা দয়া করিয়া আমায় ভালবাস, তাই তোমাদের কাছে আমার আবদার। না হ'লে, তোমাদের নিকট আমি তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। তোমাদের চরণেও স্থান পাইবার যোগ্যা নহি।" -

ভক্তিভাবে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে

সুভদ্রার চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সত্যভামার চক্ষুও ছলছল করিতে লাগিল।

"না, দিদিমণি আমার, তোমার দাদার ন্যায় তুমিও আমার হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্যা। আমিত তোমাতে তোমার দাদার ছায়া দেখিয়া আত্মহারা হই! তাই তাঁহার অভাবে তোমাকে বক্ষে রাখিয়া কত সুখ পাই। তুমি যে আমার কিরূপ যত্নের, তাহা তুমি বুঝিতে পার।" সত্যভামা এই বলিয়া তাঁহাকে কত আদর করিতে লাগিলেন, কত স্নেহ মমতা দেখাইলেন। তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া যেন কত শান্তি পাইলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইল এবং বলিলেন,—"তোমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী কে আছে দিদিমণি?"

"হাঁ, বৌদিদি, যে জন নিয়ত গোলোকধামে বাস করিয়া, লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ নারায়ণ নিত্য দর্শন করিতেছে, তাহার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে? যাহার দাদা নারায়ণ, বৌদিদি

সত্যভামা—সরস্বতী ও রুক্মিণী—লক্ষ্মী, তাঁহাদের যে সেবিকা ও স্নেহের অধিকারিণী—তাহার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে বৌদিদি? তোমরা সৌভাগ্যবতী করিয়াছ, তাই আমি সৌভাগ্যবতী, নচেৎ আমি কে?"

এই কথা বলিতে বলিতে সুভদ্রা আত্মহারা হইলেন। তখন অদূরে কোলাহল আরম্ভ হইল। দ্বারকা হইতে পুত্রকন্যাগণসহ রুক্মিণী রৈবতকে আসিয়াছেন এবং স্নেহভরে—"কোথায় সুভদ্রা? কোথায় সত্যভামা?" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। রুক্মিণীকে দেখিবামাত্র, সত্যভামা আত্মহারা-সুভদ্রার কাণে কাণে "এস সুভদ্রা, দিদি আসিয়াছেন" এই বলিয়া ছুটিয়া যাইয়া রুক্মিণীর চরণে প্রণাম করিলেন।

"পতি—সোহাগিনী হও" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে রুক্মিণী সত্যভামাকে আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। সত্যভামা

সপত্নীর মুখে রমণীগণের চিরবাঞ্ছিত আশীর্ব্বাদ শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পুনর্ব্বার রুক্মিণীর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন।

পরক্ষণেই সুভদ্রা রুক্মিণীকে প্রণাম করিলেন। "শীঘ্র পতিপুত্রবতী হও" বলিয়া রুক্মিণী আশীর্ব্বাদ করিলেন। সস্নেহে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ লইলেন। তখন সত্যভামা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"দিদির আশীর্ব্বাদ বৃথা হইবে না। সুভদ্রা, শীঘ্রই তোমার মনের মত পতি লাভ হইবে।" এই কথা বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

রুক্মিণী আনন্দের সহিত সত্যভামাকে বলিলেন ঃ—"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। নারায়ণ যেন আমার আশীর্ব্বাদ সফল করেন।" এই বলিয়া রুক্মিণী সুভদ্রাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"সুভদ্রা, আজ তোমাকে এসাজে বেশ মানাইয়াছে। আজ তোমাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি, অলুলায়িত

কেশ, আর উদাসিনীর বেশ, এবয়সে কি শোভা পায় ? নিজেই দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া দেখ, আজ তোমাকে কত সুন্দর দেখাইতেছে। এ বেশে কি তোমার নারায়ণের সেবা হয় না ?”

“বাল্যকাল শিক্ষার সময়। সেই সময়ে বিলাসী হইলে শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং সংযতচিত্তে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। তোমার দাদাও সেই জন্য তোমার প্রতি এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তোমার শিক্ষার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তুমি রমণীর আদর্শ হইয়াছ। তোমার দাদা বলিয়াছেন— “আমার যাহা কিছু ছিল সমস্তই সুভদ্রাকে দিয়াছি। কি শস্ত্র কি শাস্ত্র সকল বিষয়েই সুভদ্রা আমার সমকক্ষ। তোমরা আমাতে যে সকল গুণ দেখিতে পাও, তাহার সমস্ত গুণগুলিই সুভদ্রাতে প্রতি ফলিত হইয়াছে।”

সুভদ্রা এইরূপ আত্মপ্রশংসা শুনিয়া

লজ্জিতা হইলেন। কৃষ্ণপুত্রগণ তখন তাঁহাকে আনন্দের সহিত ঘিরিয়া ধরিলেন। সুভদ্রা তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর স্নেহ দেখাইয়া তাহাদের সঙ্গে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

এদিকে সত্যভামা রুক্মিণী দিদিকে মন্দিরের সাজসজ্জা ও উদ্যানের শোভা দেখাইয়া তাঁহার সহিত বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন এবং কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বন্ধীয় নানা কথায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

—০—

চতুর্থ অধ্যায়।

—*—
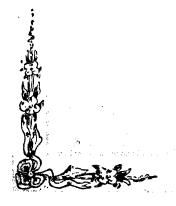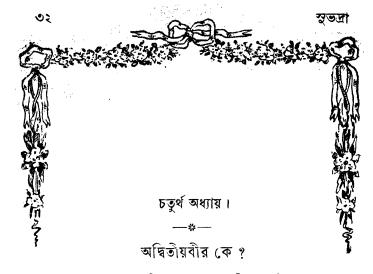
অদ্বিতীয়বীর কে ?

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। তখনও সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে প্রবেশ করেন নাই। যতই বেলা হইতেছে, সত্যভামার উদ্বেগ ততই বাড়িতেছে। তিনি আর বিশ্রাম-গৃহে থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া সুভদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—শয়নগৃহে বসিয়া একাকিনী সুভদ্রা কি ভাবিতেছেন। তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া সত্যভামা বলিলেন,—"সুভদ্রা, আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, জগতের অদ্বিতীয় বীরের দর্শন পাইব।"

সুভদ্রা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন? যিনি জগতের অদ্বিতীয় বীর, আমরা ত প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ইহা অপেক্ষা আর বেশী সৌভাগ্য কি হইবে বৌদিদি? যিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়াছিলেন,—যে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তোমার পিতা স্যমন্তকসহ তোমাকে দান করিয়াছেন, সেই বীরত্বের কথা কি ভুলিয়া গেলে?" এইরূপ ভাবে দাদার বীরত্ব বর্ণন করিতে করিতে সুভদ্রার মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বকাহিনী শুনিয়া সত্যভামা মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সুভদ্রাকে উত্তেজিত করিবার জন্য ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, —"ওঃ, বুঝিয়াছি তুমি তোমার দাদার বীরত্বের কথা বলিতেছ? হাঁ তিনি বীরই বটে, তিনি যে পূর্ব্বজন্মে জাম্ববানের গুরু ছিলেন, ভাগ্যে সেই পরিচয়ে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং

জম্বাবতীও লাভ করিয়া ছিলেন। নচেৎ কি হইত কে জানে?" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় সুভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুভদ্রা এই কথা শুনিয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেন বৌদিদি, "তুমি কি জাননা, দাদা বড় বৌদিদির উদ্ধার সাধন সময়ে একাকী, রুক্ম ও শিশুপালকে সসৈন্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ বীরত্বের তুলনা কোথায়?" সুভদ্রা উৎসাহের সহিত এই কথা বলিতে না বলিতেই সত্যভামা উচ্চহাস্যের সহিত বলিলেন—"উদ্ধার সাধনের সময়ে নয় সুভদ্রা, উদ্ধার সাধনের সময়ে নয়—চুরি করিবার সময়। সাধু ভাষায় বলিতে গেলে, রুক্মিণী-হরণ সময়ে নিরাপদে পলায়নের বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন বটে। এই বীরত্বের প্রশংসার ভাগ তোমার দাদার অপেক্ষা রথের অশ্ব দ্বয়েরই অধিক প্রাপ্য—সারথি দারুকেরও কিছু বাহাদুরী থাকিতে পারে।"

সত্যভামার কথায় সুভদ্রা একটুকু অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু নিরস্ত হইলেন না। তিনি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"দাদার বীরত্বের তুলনা কোথায় ? তিনি বাল্যকালে যে সকল বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তির জীবনে কখনও সেইরূপ বীরত্ব কাহিনী শুনিয়াছ কি ?—

"তিনি দুগ্ধ পোষ্য শিশুর অবস্থায় পুতনা নামক ভীষণা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। শৈশবে বকাসুর অঘাসুর প্রভৃতি কংশের প্রেরিত গুপ্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

তারপর দাদার কৈশোরের বীরত্ব-কথা মনে কর দেখি ? কংশ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু দাদা সরল প্রাণে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা কংশের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন চানুর ও মুষ্টিক নামক কংশসেনাপতিদ্বয় নিরস্ত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক

দ্বয়কে হঠাৎ আক্রমন করিল। তাঁহারা অভাবনীয় আক্রমনে ভীত বা ব্যতিব্যস্ত হইলেন না। তাঁহাদের শরীরে যেন অযুত হস্তীর বল সঞ্চারিত হইল। নিরস্ত্র ভ্রাতৃদ্বয় বীরদ্বয়কে মল্ল যুদ্ধে অনায়াসে বিনাশ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই কুবলয় নামক মত্তহস্তী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দাদা বাম হস্তে তাহার পুচ্ছ ধরিয়া চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন— তাহাতেই হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যখন তাঁহারা কংশের সভায় প্রবেশ করিলেন—সৈন্য সামন্ত তাঁহাদের স্নিগ্ধ-মধুর-নয়নানন্দ দায়ক মূর্ত্তিতে, সেই কঠোর ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কংশ নিরুপায় হইয়া একাকীই সেই নিরস্ত্র বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন। দাদা তখন তাঁহার অস্ত্র

কাড়িয়া লইয়া মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। একদিকে সেই ভারতের শ্রেষ্ঠবীর কংশ, অপর দিকে ষোড়শবর্ষীয় বীর শ্রীকৃষ্ণ—সভাশুদ্ধ লোক দর্শক মাত্র। এ অবস্থায় কে জিতে, কে হারে, দেখিবার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন। তাহারা যখন দেখিল দাদা কংশকে পাতিত করিয়া বক্ষের উপর বসিয়াছেন, এবং বাম হস্তে সবলে গলদেশে এবং তাঁহার প্রাণ বায়ু বাহির করিতেছেন, তখন সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি এক দিকে কংশকে নিধন করিলেন অপর দিকে মথুরা অধিকার করিলেন। কিন্তু নিজে রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কংশের পিতাকেই সিংহাসনে বসাইলেন! এখন বলত বৌদিদি এরূপ বীরত্ব আর কাহারও জীবনে শুনিয়াছ কি ?”

এই কথা বলিয়া সুভদ্রা আগ্রহের সহিত সত্যভামার দিকে চাহিলেন। তিনি মনে ভাবিয়া-ছিলেন—এবার আর সত্যভামার আপত্য করিবার কোন্ কারণ নাই, নিশ্চয়ই তিনি দাদাকে সর্ব্ব

প্রধান বীর বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া উৎফুল্ল হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহা স্বীকার করিলেন না। বলিলেন—"হাঁ ইহা বীরত্ব বটে—ভাগ্যে তোমার বড় দাদা সঙ্গে ছিলেন! তোমার ছোট দাদার ভাগে ইহার কতটুকু অংশ আছে কিরূপে বুঝিব। আর সেই বীরত্বের পরিণামও ত এই দেখি—জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় পলায়ন!"

"বৌদিদি তুমি ভুল বলিতেছ; দাদা কি জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকায় পলায়ন করিয়াছেন? তাহা কখনই নহে। যতবার জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিয়াছে, দাদা প্রত্যেক বারেই তাহাকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি জানেন—জরাসন্ধ যদুবংশীয়দের অবধ্য। এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অসংখ্য প্রাণী হত্যা হইতেছে। করুণ-হৃদয় দাদা সেই জন্যই মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়াছেন,

জরাসন্ধের ভয়ে নয় বৌদিদি।” সুভদ্রার এই কথা শুনিয়া সত্যভামা ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—

“প্রাণী হত্যা নিবারণের জন্যই হউক বা জরাসন্ধের ভয়েই হউক, নিজের রাজ্য ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে ত? থাক্ আর তোমার দাদার বীরত্বের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা করিনা। আবার কোন্ দিন কোন্ বীরের ভয়ে আদরের ভগ্নী “সুভদ্রা” দিয়া অব্যাহতি পান, আমি সেই চিন্তায় অস্থির।” এই বলিয়া যেমন হাসি মুখে সুভদ্রার দিকে চাহিলেন—সুভদ্রা সজল নয়নে সত্যভামাকে বলিলেন—“বৌ দিদি, আমার দাদা শ্রেষ্ঠ বীর হউন বা না হউন, তোমার মুখে তাঁহার নিন্দা শোভা পায়না। পতিনিন্দা—মহাপাপ! তুমি এমন পাপে কেন লিপ্ত হও বৌদিদি।”

সত্যভামা সুভদ্রার মুখে কৃষ্ণগুণ শুনিতে শুনিতে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, সুভদ্রার কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সস্নেহে সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“না দিদিমণি আমার

তোমার দাদার নিন্দা করিয়া তোমাকে দুঃখিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার দাদা নিজেই বলিয়াছেন "অর্জ্জুনই ভারতে অদ্বিতীয় বীর।" আজ সেই অর্জ্জুনের আগমন হইবে, সেই জন্যই আমি বলিয়াছি—আজ আমাদের সেই অদ্বিতীয় বীরের সাক্ষাৎ লাভ হইবে। তোমার দাদার মুখে অর্জ্জুনের বীরত্ব কাহিনী যাহা শুনিয়াছি,তাহার মধ্যে কেবল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কথাই এখন তোমাকে বলিতেছি—মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর !—

"দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদরাজ জগতের অদ্বিতীয় বীরকে কন্যা সম্প্রদান মানসে মৎস্যচক্র নির্ম্মাণ করেন। অতিউচ্চে একটী মৎস্য স্থাপিত রহিয়াছে ; নিম্নে একটী চক্র অনবরত ঘুরিতেছে। চক্রের ঠিক মধ্য স্থলে কেবলমাত্র একটী বাণের ফলকের প্রবেশ পথ আছে। নিম্নে সলিলাধার পূর্ণ স্বচ্ছ বারি। তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া যিনি চক্রের ছিদ্র পথে বাণ প্রবেশ করাইয়া মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন, দ্রৌপদী তাহাকেই মাল্য প্রদান করিবেন।

ভারতের রাজ্যে রাজ্যে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। বীরভূমি ভারতের বীরগণ সকলেই স্বয়ম্বর সভায় সমবেত হইয়াছেন। অসংখ্য মহামহাবীরের সমাবেশে স্বয়ম্বর সভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিছে।

নানা বেশভূষায় সজ্জিতা দ্রৌপদী বরমাল্য হস্তে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপের প্রভায় বীরহৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার অনল জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মৎস্যচক্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া নিরাশার আশঙ্কায় তাহাদের চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল।

যখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বীরগণ ক্রমে ক্রমে মৎস্য চক্রভেদ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অন্যান্য বীরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ধনুর্ব্বাণ ধরিতে আর কাহারও সাহস হইল না।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বাধা জন্মিল দেখিয়া তদীয় ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীসহ সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করিয়া দ্রৌপদী লাভের

পণ পুনঃপুনঃ প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষত্রসভা হইতে আর একটী প্রাণীও সাহস করিয়া ধনুক ধরিতে উঠিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ স্বয়ম্বর সভা নীরব, নিস্তব্ধ। ক্ষত্রিয়সভা লজ্জায় অধোবদন—ব্রাহ্মণ-সভা নিরাশায় বিষণ্ণ—সাধারণ জনসঙ্ঘ, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত। এই সময়ে ব্রাহ্মণ সভা হইতে এক যুবক দণ্ডায়মান হইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

ক্ষত্রিয় সমাজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া অট্টহাস্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার দুরাশা দেখিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। চারিদিক হইতে ব্যঙ্গ ধ্বনির কোলাহল উঠিল। পথি-পার্শ্বস্থিত জনগণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে গমনোন্মুখব্যক্তিকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ সভা হইতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"যাহার যে শক্তি আছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে

পারে, অন্যের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যে ব্যক্তি লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে যাইতেছে তাঁহাকে আমাদের বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে কার্য্যে শত শত ক্ষত্রিয় অসমর্থ হইয়াছে, সেই কার্য্যে ব্রাহ্মণ সভার একজন অপারগ হইলে ব্রাহ্মণদের কলঙ্কের কোন সম্ভাবনা নাই। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুণ—যুবক সফল মনোরথ হইয়া আপনাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।” তখন ব্রাহ্মণ-গণ নিরস্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণের হাস্য কোলাহলও নীরব হইল।

যুবক ধীরমন্থর গমনে লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অজানুলম্বিত বাহু এবং পদ্ম পত্রের ন্যায় নেত্র যুগলে ক্ষত্রতেজ যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। যুবক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া জলের ছায়ায় লক্ষ্য দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার ধনুধারণের অপূর্ব্ব কৌশল ও লক্ষ্য

লক্ষ্যের অভিনব উপায় নিদ্ধারণ দেখিয়া ক্ষত্রিয় সভায় হুলস্থূল উপস্থিত হইল। সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। মূহুর্ত্তের মধ্যে একটী বাণ চক্রপথ অতিক্রম করিয়া মৎস্য চক্ষু বিদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ-গণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয়গণ ভ্রূকুটী ভঙ্গে স্ব স্ব মনোক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য বিদ্ধ স্বীকার করিলেন না। যুবক তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। আর একটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যটিকে দ্বিখণ্ড করিলেন। চক্ষুবিদ্ধ মৎস্য নিম্নে পতিত হইল, তখন আর কাহারও অস্বীকার করিবার কোন কারণ রহিল না।

দ্রৌপদী বরমাল্য সহ যুবককে বরণ করিতে আসিলে, যুবক তাঁহাকে বারণ করিলেন। ইতি মধ্যে ক্ষত্রিয়রাজগণ যুবককে ধন, রত্ন, রাজ্য প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া দ্রৌপদীর ন্যায় রমণী-রত্ন লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যুবক

কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ক্ষত্রিয়-গণ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদী গ্রহণে বদ্ধ পরিকর হইলেন। লক্ষ লক্ষ বীর এক সঙ্গে যুবককে আক্রমণ করিল। স্বয়ম্বর সভা তখন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। যুবক একাকী সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ধনু ধারণ সার্থক হইল। যুবকের বীরত্বে সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া তাঁহাকে আর আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। তখন মেঘমুক্তশশীর ন্যায় যুবক দ্রৌপদীকে সঙ্গে করিয়া অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের, সহিত মিলিত হইলেন। মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

তোমার দাদা, যুবকের এই একদিনের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার সখ্য ভিক্ষা করিলেন। শেষে পরিচয়ে জানিলেন, যুবক তাঁহার পিতৃস্বসা কুন্তীর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন, হস্তিনাপুরের রাজা

পাণ্ডুর পুত্র। দুর্য্যোধনের ষড়যন্ত্রে জতুগৃহদাহের পর হইতেই পঞ্চপাণ্ডব মাতৃসহ ছদ্মবেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই কারণে স্বয়ম্বর সভায় ব্রহ্মচারীর বেশে বসিয়াছিলেন। যিনি একাকী লক্ষ লক্ষ নরপতিকে পরাজিত করিতে পারেন, তিনি কি বীরশ্রেষ্ঠ নহেন ?”

অর্জ্জুনের বীরত্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে বীরবালা সুভদ্রা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ আরক্তিম হইল, ধমনীতে যেন তড়িদ্বেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—“হাঁ বীরের মত বীর বটে! কিন্তু দাদা যদি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেন, তবে বরং ইঁহাকে দাদার উপরে স্থান দিতে পারিতাম। কিন্তু দাদা ত লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। দ্রৌপদী লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়াও অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হন নাই।”

"শক্তি থাকিলে কি তিনি বসিয়া থাকিতেন? যিনি রুক্মিণীর লোভে দ্বারকা হইতে সুদূর ভীষ্মক রাজার রাজ্যে গিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকিয়া, দ্রৌপদীর মত রমণীরত্নের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না। লক্ষ লক্ষ পরাজিত রাজগণের মধ্যে যে তিনিও একজন ছিলেন না, তাহাই বা কে বলিবে?" সত্যভামা এই কথা বলিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রা অর্জ্জুনের বীরত্বে মুগ্ধা হইয়াছিলেন; আগ্রহের সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবরণ সত্যভামার নিকট শুনিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু সত্যভামা মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল অসম্বদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা সুভদ্রার প্রাণে সহ্য হইল না। তখন বিরক্তির সহিত বলিলেন—

"ভাল, তোমার অর্জ্জুনই জগতে অদ্বিতীয় বীর, তাঁহার বীরত্ব নিয়া তিনি থাকুন, আর তুমি তাহা জগতে প্রচার কর। কিন্তু বৌদিদি তোমার

পায়ে ধরি, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করিতে যাইয়া, তুমি আমার দাদার বিরুদ্ধে অযথা নিন্দা প্রচার করিও না। তিনি তোমার স্বামী, স্বামীনিন্দা মহাপাপ।” এই বলিয়া সুভদ্রা সত্যভামার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সত্যভামা লজ্জিতা হইলেন। সুভদ্রার ভ্রাতৃভক্তির আতিশয্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে যেন আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল। তখন সস্নেহে সুভদ্রাকে উঠাইয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমায় ক্ষমা কর দিদিমণি, আমার অন্যায় হইয়াছে। যে কথায় তুমি মনে কষ্ট পাও, এমন কথা আর বলিব না। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছিলাম।

সত্যভামার কথায় বাধা দিয়া সুভদ্রা বলিলেন—“তুমি ভুল বুঝিয়াছ বৌদিদি, দাদা বলিয়াছেন—পরিহাস ছলে স্বামী নিন্দাত দূরের কথা—পরনিন্দাও করিতে নাই। সাধারণতঃ লোকনিন্দা করাই পাপ, তার উপর পতি-নিন্দা!

সুভদ্রার কথা শেষ করিতে না দিয়া সত্যভামা বলিলেন—"থাক্, থাক্! বন্ধ্যার পুত্রশোক যেমন অসম্ভব, তোমার নিকট হইতে পতিনিন্দা বা পতিসেবার উপদেশ গ্রহণও ঠিক সেইরূপ। অগ্রে বিবাহ হউক—পতিলাভ কর, তখন দেখিবে প্রয়োজনমত পতিনিন্দা করিতে হয় কিনা? এবিষয়ে তোমার দাদার অপেক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।"

সত্যভামা এই বলিয়া সুভদ্রার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। বিষণ্ণবদনা সুভদ্রা তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইলেন না। সত্যভামা সুভদ্রাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নানারূপ আদর মমতা জানাইলেন। সদাহাস্যময়ী সুভদ্রার বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য তাহাকে লইয়া প্রমোদবনে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

আবাহন।

অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর নিম্নভাগ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষাগ্রভাগে আশ্রয় লইয়াছে। উদ্যানের পুষ্পকলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। মৃদুমন্দ গন্ধবহ পুষ্পসৌরভে সুবাসিত হইয়া সৎসঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মধুকর পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু সংগ্রহ করিয়া গুণ গুণ রবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। বসন্তের চিরসহচর কোকিলের কুহুতানে প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে।

এমন কমনীয় বাসন্তী সন্ধ্যার প্রাক্‌ভাগে রৈবতকের প্রমোদবনে বসিয়া এক কিশোরী একাগ্রমনে মালা গাঁথিতেছেন। আর এক যুবতী পুষ্পবৃক্ষের

সৌন্দর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া পুষ্পাচয়ন পূর্ব্বক বৃক্ষগুলির সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছেন। উভয়েই স্ব স্ব কার্য্য এরূপ মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিতেছেন যে, অন্য বিষয়ে লক্ষ্য করিবার তাঁহাদের অবসর নাই।

প্রমোদ বনের পার্শ্বেই রৈবতকে প্রবেশ পথ। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসখা অর্জ্জুন সহ সেই পথেই রৈবতকে প্রবেশ করিলেন—কিশোরী কি যুবতী কেহই তাহা লক্ষ্য করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আপন মনে চলিতেছেন, অর্জ্জুন নূতন স্থানের নূতন শোভায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি মাল্যরচনায় নিবিষ্টমনা কিশোরীর উপর পড়িল। চরণ অচল হইল। সবিস্ময়ে নির্ণিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একি!—উদ্যান শোভাবর্দ্ধন-কারিণী অপূর্ব্ব প্রস্তর-মূর্ত্তি! শিল্পীর কি নির্ম্মাণ কৌশল—এমন কারুকার্য্য সুশোভিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথাও তো দেখি

নাই। না, না—এ যে সত্য সত্য মালা গাঁথিতেছে ! এ মানবী—না দেবী ? মানবে কি কখনও এরূপ সৌন্দর্য্য সম্ভবে ? আহা কি রূপ ! কি লাবণ্য ! ইনি নিশ্চয়ই বনদেবী।

অর্জ্জুন এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে দ্রুত গমনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখে! ঐ উদ্যানশোভা দেবী প্রতিমা—"

অর্জ্জুনের প্রশ্ন সম্পূর্ণ না হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এ যে আমার ভগ্নী সুভদ্রা !"

অর্জ্জুন বিস্ময়ে আবার সুভদ্রার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন—"এযে আমার ভগ্নী সুভদ্রা," তখন সুভদ্রা ও সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল—তাঁহাদের চিরপরিচিত বীণা-বিনিন্দিত সুললিত স্বর এককালীন উভয়ের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। উভয়েই সেই মধুর

স্বর অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—কৃষ্ণার্জ্জুন তাঁহাদের অদূরে।

সহসা অর্জ্জুনকে ঐরূপ ভাবে দেখিয়া সুভদ্রা লজ্জায় মস্তক নত করিলেন। অর্জ্জুনও লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু চক্ষু একেবারে ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না—যাইতে যাইতে গ্রীবাবক্র করিয়া কুটিলকটাক্ষে সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

সুভদ্রা কৃষ্ণার্জ্জুনের অবয়বে অচিন্তনীয় সাদৃশ্য অনুভব করিয়া আর একবার দেখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লজ্জা তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি অবনত মস্তকেই গোপনে সে মূর্ত্তি দেখিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল কিনা তিনিই জানেন।

সত্যভামা দূর হইতে অর্জ্জুনের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া, যেন তাঁহার বাঞ্ছিত কার্য্যের চরিতার্থতার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

সত্যভামা সাঙ্কেতিক শব্দ করিবামাত্র হঠাৎ চারিদিক হইতে অভ্যর্থনাসূচক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বন্দীগণ অগ্রসর হইয়া এক দল যদুবংশের, অপর দল কুরুবংশের বন্দনা-সঙ্গীত আরম্ভ করিল। কৃষ্ণার্জ্জুন পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাদের মধ্য দিয়া ধীরমন্থর গমনে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী ও সত্যভামাকে অর্জ্জুনের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সুভদ্রাকে তখন ডাকিয়া পাইলেন না।

কৃষ্ণার্জ্জুন দর্শন করিয়া সুভদ্রার মনোভাব একটুকু বিচলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্জ্জুনের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কে একস্থানে সম্মিলিত ভাবে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা সুভদ্রার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তেমন সুযোগ কিরূপে ঘটিবে, এই চিন্তা করিতে করিতেই সুভদ্রার মন বিচলিত হইল। তখন তাঁহার মালা গাঁথাও শেষ হইয়াছে। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া

নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় করস্থিত পুষ্পহারে কৃষ্ণবলরামের মূর্ত্তি সাজাইলেন এবং স্বয়ং আরতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

মনে কোন কারণে অশান্তি উপস্থিত হইলে, হয় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত মধুরবাণী শুনিয়া, না হয় রামকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিয়া সুভদ্রা সেই অশান্তি বিদূরিত করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট হইতে তাহার তীর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অদ্যকার আরতিতে একটু বিশেষত্ব অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন,—সুভদ্রা নিজেই আজ আরতি করিতেছেন। স্বয়ং তাহার ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে চলিলেন এবং অর্জ্জুনকেও সঙ্গে লইলেন।

অর্জ্জুন দেখিলেন—এক কিশোরী দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া

কৃষ্ণবলরামমূর্ত্তির আরতি করিতেছেন। কিশোরী ভক্তিতে বিহ্বলা, বাহিরের কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য নাই; তিনি প্রাণের মধ্যে ভগবানকে স্থাপন করিয়া যেন আনন্দসাগরে মগ্ন রহিয়াছেন।

সম্মুখস্থ রত্নবেদীতে রামকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি—ব্রজবেশে—ত্রিভঙ্গিমঠামে অবস্থিত। অর্জ্জুন বিস্ময়ের সহিত একবার রত্নবেদীতে ও একবার পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অর্জ্জুনের প্রাণে বাসনা জাগিতেছে—আর একটী পঞ্চপ্রদীপ পাইলে, তিনি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত সজীব মূর্ত্তিটীকে আরতি করেন। অর্জ্জুন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন—"সখে, দেবতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—"পূজকের সুবিধার জন্য।"

অর্জ্জুন দেখিতেছেন—কিশোরীর ভক্তি-

মুগ্ধতন্ময়ভাব, প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচন, আর আরতি কালীন অঙ্গভঙ্গী। যতই দেখিতেছেন, ততই মুগ্ধ হইতেছেন। তিনি ভক্ত দেখিবেন, কি ভগবান দেখিবেন, তাহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পার্শ্বস্থিত সজীব দেবতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তিনি নিস্পন্দ, নিশ্চল; তাঁহার প্রাণ যেন ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তর মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়াছে; প্রস্তর মূর্ত্তিও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়াছে॥

সুভদ্রার আরতি শেষ হইল। শঙ্খঘণ্টার বাদ্যধ্বনি নীরব হইল। বসনাঞ্চলভাগে গলদেশ বেষ্টন করিয়া সুভদ্রা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রাঙ্গনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—"কৃষ্ণার্জ্জুন দণ্ডায়মান।" তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া অন্য পথে প্রস্থান করিলেন। পূজকগণ অগ্রসর হইয়া অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"সখে, এ আবার কে?"

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন— "যাহাকে তুমি উদ্যানে মালা গাঁথিতে দেখিয়াছিলে, সেই সুভদ্রা।"

"সখে, আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। যেমন রূপ, তেমনই ভগবদ্ভক্তি—প্রেমে যেন আত্মহারা! ধন্য তিনি—যিনি তোমাকে এইরূপ ভাবে চিনিতে পারিয়াছেন।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ভক্তিভরে সখার পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন—অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। নর-নারায়ণের সম্মিলন ভাব দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাণিগ্রহণ।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন বসিয়া আছেন। সুভদ্রা প্রতিদিন যেমন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে আসেন, আজিও সেইরূপ আসিয়াছেন। অর্জ্জুনকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় যাইতেছেন না। সত্যভামা বলিতেছেন—"তোমার দাদার সখা, আমরা তাহার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিয়া থাকি, তোমার এত লজ্জা কেন? তাঁহার নিকটে যাইয়া কি তোমার দাদাকে প্রণাম করিয়া আসিতে পারিবে না? এত যদি লজ্জা, তবে বরং প্রণাম নাই করিলে।" সত্যভামা কথা গুলি এমন ভাবে বলিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে পান।
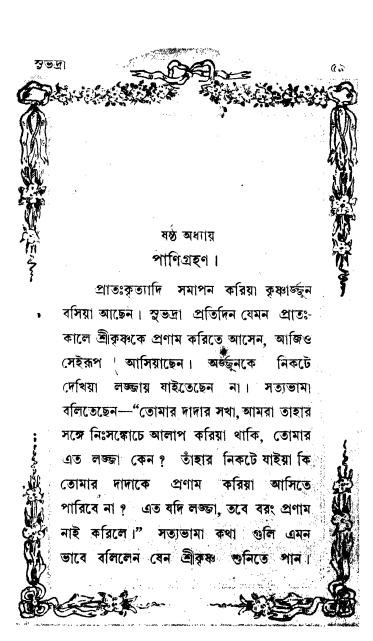
প্রকৃত পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া বলিলেন—“কি হইয়াছে সত্যভামা ?”

সত্যভামা বলিলেন—“সুভদ্রা প্রণাম করিতে আসিয়াছে, অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে।”

শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ বিজড়িত স্বরে বলিলেন—“অনুমতি কেন, ভদ্রা ? অর্জ্জুন যে আমার সখা—অভিন্ন হৃদয় ; তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিবে, তাহাতে আর লজ্জা কি ? তুমি নিঃসঙ্কোচে আসিতে পার।”

সুভদ্রা ধীরমন্থরগতিতে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, প্রথম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে লইলেন। পরে অর্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া যেমন পদধূলি লইতে হস্তপ্রসারণ করিলেন, অমনি অর্জ্জুন স্বীয় দক্ষিণ হস্তে সুভদ্রার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণে বাধা দিয়া বলিলেন—“আপনি দেবী, আপনার কৃষ্ণ-ভক্তির শতাংশের একাংশ পাইলে আমি আমাকে

চরিতার্থ বোধ করিতাম। আমি আপনার প্রণাম গ্রহণের অযোগ্য।"

পরস্পরের হস্ত-সংস্পর্শে তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে যেন কি বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিছুকালের জন্য তাঁহারা নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় রহিলেন। সত্যভামা পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি হইল, সত্যভামা?" গবাক্ষ পথে মুখ বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে সত্যভামা বলিলেন—"বিশেষ কিছু নয়—'পাণিগ্রহণ'।

অর্জ্জুন সুভদ্রার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন— সুভদ্রা ব্যস্তভাবে সরমজড়িত-চরণে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের হৃদয়ে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত রাখিয়া গেলেন,—প্রাণে যেন কি এক দুরাশার চিত্র আঁকিয়া দিলেন। অর্জ্জুন একটু বিচলিত হইলেন। মুখে বিষাদের ছায়া দৃষ্ট হইল; অথচ অন্তরে যেন আনন্দের স্রোত বহিতে

লাগিল! চিন্তাকুল চিত্তে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

সত্যভামা অন্তরাল হইতে গবাক্ষ পথে অর্জ্জুনের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, আর মনে মনে হাসিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ অর্জ্জুনের মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন রঙ্গময়ী সত্যভামা বলিতে লাগিলেনঃ—

"ব্রহ্মচারী মহাশয়, মণিপুরের কথা মনে পড়িল কি? কোথায় ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ মণিপুর—আর কোথায় পশ্চিম প্রান্তে সাগরোপকুলস্থিত রৈবতক পর্ব্বত। এখানে চিত্রাঙ্গদা কোথায়? এতদূরে আসিয়াও কি ব্রহ্মচর্য্যের দোহাই দিয়া মনকে স্থির করিতে পরিলেন না? ধন্য আপনাদের ব্রহ্মচর্য্য, ধন্য আপনাদের সংযম শিক্ষা।"

সহসা শত শত বাণ বিদ্ধ হইলেও বোধ হয় অর্জ্জুনের মনে যত কষ্ট না হইত, সত্যভামার মিষ্ট তিরস্কারে তাঁহার ততোধিক কষ্ট হইয়াছিল। কি করেন—লজ্জায় ঘৃণায় আরও কিছুকাল অধোমুখে রহিলেন। পরে কাতর নয়নে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সত্যভামার তিরস্কার অর্জ্জুনের প্রাণে বড়ই লাগিয়াছে। তিনি অর্জ্জুনের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বলিলেন,—"চল সখে, রৈবতকের দর্শনীয় স্থানগুলি তোমাকে দেখাইয়া আনি। বিশেষতঃ দ্বারাবতীর প্রবেশ-দ্বার রৈবতককে আমি কিরূপ ভাবে সুরক্ষিত করিয়াছি, তোমার মত জগতের অদ্বিতীয় বীরকে তাহা দেখান নিতান্ত প্রয়োজন। আমি আরও আশা করি, তোমার নিকট এবিষয়ে অধিকতর উপদেশ পাইব। দ্বারাবতীর প্রবেশ দ্বার যেরূপ সুদৃঢ় ও সুকৌশলে নির্ম্মিত, তাহাতে আমি বিশ্বাস করি, আমার ভগ্নী সুভদ্রা একাকিনী ধনুর্ব্বাণ হস্তে কোন একস্থানে সজ্জিতা থাকিয়া

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের আক্রমণ হইতে দ্বারাবতীকে রক্ষা করিতে পারে।”

অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“সখে, বল কি? কিশোরী বালিকার এতগুণ?—মৃণাল-কোমল ভুজে এত শক্তি?”

শ্রীকৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন—“সখে, সখে, সুভদ্রা জগতে অমূল্য রত্ন; এ রত্ন ধরায় দুষ্প্রাপ্য। আমার দ্বারাবতীতে দ্বিতীয় নাই, জগতে আছে কি না জানি না। সুভদ্রার রূপ তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ—কিন্তু গুণ বর্ণনাতীত, আমি কথায় তোমাকে কিরূপে বুঝাইব?”

এই শুনিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত ভাবে, উৎফুল্ল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় যেন প্রার্থনা জানাইল—কৃষ্ণমুখ-নিঃসৃত সুভদ্রার গুণামৃত পান করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত-চকোর উৎকণ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন—"সখে, আজ তোমাকে আমার জীবনের শেষ ষোড়শ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্মৃতির আভাষ দিতেছি; এই সুখ-স্মৃতি সুভদ্রার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত।

"মথুরা অধিকার করিয়া সুখশান্তিতে বাস করিতেছি, জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও আমার কিছুই করিতে পারিতেছে না। সেই সময় বিমাতা রোহিণীর গর্ভ হইতে সুভদ্রা ভূমিষ্ঠ হইল। অকলঙ্ক চন্দ্রসম তাহার মুখখানি দেখিয়া প্রাণে যেন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় স্নেহের সঞ্চার হইল। কৌস্তুভের ন্যায় সতত তাহাকে বক্ষে রাখিয়া কতই সুখী হইতে লাগিলাম।

"সুভদ্রা মাতাপিতার যত্নে, আমার স্নেহে, শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যতই বড় হইতে লাগিল, ততই আমার স্নেহ বাড়িতে লাগিল। আমি আর তাহাকে ফেলিয়া দূরে থাকিতে পারিতাম না।

যখন পাঁচ বৎসরের হইল, যত্ন করিয়া তখনই তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাকে শাস্ত্রের সঙ্গে শস্ত্র বিদ্যাও শিক্ষা দিতে লাগিলাম। তাহাকে যখন যে বিষয় উপদেশ দিয়াছি, যেন পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশে, শুনিবামাত্রই তাহা শিখিয়া লইত। আমার যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, সুভদ্রা স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সমস্ত টুকু আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। শুধু আয়ত্ত কেন,—সে তাহা পরিচালনা করিয়া যদুবংশের প্রত্যেকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

"যদুবংশের প্রধানপুরুষ পিতা বসুদেব, দাদা বলরাম, সকল কার্য্যেই সুভদ্রার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মাতা দৈবকী ও রোহিণী, এবং পত্নী রুক্মিণী তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্য করেন না। অভিমানিনী সত্যভামা মুহূর্ত্তের জন্যও সুভদ্রাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন

না। আর সুভদ্রা ভক্তি-ডোরে আমাকে চির-দিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে।”

আবেগ ভরে এই কথা গুলি বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতি-জনিত সুখের চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—প্রাণে যেন অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল, তিনি নীরব হইলেন।

অর্জ্জুন তন্ময় ভাবে সুভদ্রার শিক্ষার বিষয় গুলি শুনিতে ছিলেন। শিক্ষার প্রত্যেক বিষয় সুভদ্রার রূপের সহিত তাঁহার হৃদয়পটে উপস্থিত হইয়া, যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন এই রাজ্য ছাড়িয়া যেন স্বপ্ন রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন। সুভদ্রা তাঁহার নিকট শস্ত্র ও শাস্ত্রের পরীক্ষা দিতেছেন। অর্জ্জুন এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন—সুভদ্রা যেন অনায়াসে সে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। অর্জ্জুন মধ্যে মধ্যে বাঃ বাঃ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন,—আবার যেন এই রাজ্যে ফিরিয়া

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শুনিতেছেন এবং সবিস্ময়ে বলিতেছেন—"এত রূপ—এত গুণ!"

শ্রীকৃষ্ণ অমনি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ আর কি গুণ, অৰ্জ্জুন? এ ত তাহার শিক্ষা! সামান্য পশুপক্ষীও যত্ন পাইলে এইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাহার হৃদয়ের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। তাহার হৃদয় অতি উচ্চ—অতি পবিত্র। সে হৃদয়ের ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা অতুলনীয়।"

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"অৰ্জ্জুন! সুভদ্রার ভক্তিতে বালক সাজিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহার প্রদত্ত মৃত্তিকা উপচারে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছি। পঞ্চখণ্ডকাষ্ঠে কল্পিত পঞ্চপ্রদীপের আরতিতে যেন কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। বাল্যের সেই ভক্তির খেলায় তাহার হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, গত- কল্য তাহার নিদর্শন পাইয়াছ।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ

যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন আবেগ ভরে বলিলেন—"সখা ধন্য তুমি, ধন্য সুভদ্রা, এমন দাদা না পাইলে ভগ্নী কখনও এমন হইতে পারে না।"

"সখে, সুভদ্রার স্নেহ, দয়া, সার্ব্বজনীন। সেখানে আত্মপর, শত্রুমিত্র ভেদ নাই। যেখানে রোগী, যেখানে তাপী—সেইখানে সুভদ্রা শান্তি রূপে উপস্থিত। পশুপক্ষী ও তৃণপুষ্পে তাহার দয়া সমভাবে বিরাজিত। সুভদ্রার দয়া ক্ষুধিতের নিকট খাদ্যরূপে—তৃষিতের নিকট সলিলরূপে—সর্ব্বত্র-ব্যাপিনী। যে স্থানে পশুপক্ষী অনাহারে মরিতেছে, যে স্থানে দরিদ্র ভিক্ষুক ক্ষুধায় কাঁদিতেছে—সেই স্থানে সুভদ্রা অন্নপূর্ণারূপে অবস্থিত। সে আত্মসুখ ভুলিয়া পরের সেবায় দিন যাপন করে। তুমি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়া দাও, ফিরিয়া আসিলে দেখিবে—যথাসর্ব্বস্ব দীন দুঃখীকে বিতরণ করিয়া সে নিরাভরণা যোগিনীর ন্যায় নীরবে গৃহকোণে

বসিয়া আছে। গালি দাও—মন্দ বল—তবু তাহার মুখে মৃদুমন্দ হাসি। সে হৃদয়ে ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বলিতে ছিন্নতার বীণার ন্যায় সহসা নীরব হইলেন। আকাশ পানে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

"যিনি অন্যের দুঃখে সর্ব্বস্ব দান করেন, তিনি কি এ হতভাগ্যের দুঃখে শুধু স্বীয় মনটুকু দিতে পারেন না?" ভাবে বিভোর অর্জ্জুন মনে মনে সুভদ্রা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে প্রকাশ্য ভাবে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া যেমন চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন—সম্মুখে সত্যভামা। অমনি লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

"আর চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইবে না সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনাকে বেশ চিনিয়াছি। এখন বেলা দ্বিতীয়প্রহর অতীত, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। সত্বর আসিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করুন।"

সত্যভামার ঝঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণের চমক ভাঙ্গিল।

তিনি সখা অর্জ্জুনসহ গাত্রোত্থান করিয়া, সত্য-ভামার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

শুভদৃষ্টি।

অর্জ্জুন কৃষ্ণসহ দ্বারাবতীতে আসিয়াছেন। যাদবগণ তাঁহাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, এমন অভ্যর্থনা তিনি আর কোথাও পান নাই। এখানে যে পাইবেন এরূপ কল্পনাও তাঁহার মনে হয় নাই।

বসুদেব, রোহিণী, দৈবকী, কৃষ্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্নেহ করিতেছেন। যাদবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণের মত ভক্তি দেখাইতেছেন। কৃষ্ণপত্নীগণ নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন, আদর করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ত অভেদভাবে বর্ত্তমান। বলরাম, আত্মীয় ও অতিথির প্রতি যতদূর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন তাহা দেখাইতেছেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ অনুসারে, অর্জ্জুন তাঁহার তীর্থদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা এরূপ সুমধুর ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে তাঁহার বচনসুধা পান করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা রমণীগণের এক পার্শ্বে সত্যভামার নিকটে বসিয়া উহা শুনিতে ছিলেন। তিনি অনিমেষ নেত্রে অর্জ্জুনের মুখের দিকে এইরূপ ভাবে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি শুনিতেছেন কি দেখিতেছেন, সত্যভামা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

আর এক দিন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুনের অস্ত্র-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইল। একখণ্ড প্রশস্ত সমতল ভূমি ক্রীড়াস্থল-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দর্শক মণ্ডলীর জন্য আসন স্থাপিত। তাহার উপরিভাগে মণ্ডলাকার দ্বিতল কাষ্ঠমঞ্চে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথগাসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ক্রীড়া আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই নিম্নের এবং

উপরের উভয় আসনই যাদব যাদবীগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলে সোৎসুক নেত্রে ক্রীড়া আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বসুদেব ও বলরামের আদেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে অস্ত্র-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন অস্ত্রক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ধনুকের জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া অদ্ভুত কৌশলের সহিত অনবরত বাণবৃষ্টি করিতেছেন। সভাস্থিত বীরগণ উহা নির্ণিমেষ নয়নে দেখিতেছেন ও অর্জ্জুনকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন। রমণীগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মস্তকোপরিস্থিত রমণীগণের আসন হইতে একছড়া পুষ্পহার এমন সুকৌশলে পতিত হইল যে, উহা ঠিক তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। অর্জ্জুন উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিলেন—যবনিকা অন্তরালে সুভদ্রা। তাঁহাদের চারি চক্ষু মিলিত হইল। লজ্জিতা সুভদ্রা বিদ্যুদ্বৎ প্রস্থান

করিলেন। পার্শ্বস্থিত সত্যভামা মৃদুমন্দ হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের হস্ত ধরিয়া সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অর্জ্জুনও যন্ত্রবৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

সে দিন সমস্ত রাত্রি অর্জ্জুনের নিদ্রা হইল না। কেবল ভাবিলেন—'একি সুভদ্রার অনুরাগের চিহ্ন, না সত্যভামার প্রসাদ ?'

অর্জ্জুন রৈবতকে প্রথম দিন সুভদ্রাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নারায়ণের আরতি দর্শন করিয়া আরও মোহিত হইয়াছেন। সত্যভামার মুখে পাণিগ্রহণের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ মুখে তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগরিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ এ মাল্যপ্রদান ব্যাপার তাঁহাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তখন সুভদ্রা তাঁহার ধ্যান, সুভদ্রা তাঁহার জ্ঞান।

তিনি সমস্ত জগত যেন সুভদ্রাময় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলে কি হইবে, পাইবার উপায় কি? প্রাণ থাকিতেও কৃষ্ণের নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। একমাত্র উপায় সত্যভামা। সঙ্কল্প করিলেন—কাল পায়ে পড়িয়া সত্যভামার নিকট সুভদ্রা ভিক্ষা চাহিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

আত্মদান।

সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দিনে প্রথম তাঁহাকে দেখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আকৃতির সহিত অর্জ্জুনের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার বাসনা হয়। কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জা সে বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। তিনি আরতির সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পলায়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে যাইয়া তৃতীয় বার দেখেন। যখনই তিনি অর্জ্জুনের

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখনই যেন তাহা অর্জ্জুনের চক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং সুভদ্রা অর্জ্জুন-মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পারেন নাই। যতই বাধা পাইতেছেন, ততই যেন তাঁহার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। তখন চুরি করিয়া দেখিবার বাসনা জাগিল। আমি তাঁহাকে দেখিব, তিনি যেন আমাকে না দেখেন—এইরূপ অবস্থার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু সত্যভামা সদাসর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তাঁহার কথায় বার্ত্তায় আলাপ ব্যবহারে সুভদ্রা বুঝিলেন—তিনি যেন অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনের গুণ-বর্ণনা করেন; সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের ক্ষণস্থায়ী দর্শনের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু কাহারও বাসনা তৃপ্তির উপায় দেন না, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

সুভদ্রা অর্জ্জুনকে দেখিতে লালায়িত হইলেন। অর্জ্জুনের গুণাবলী পুনঃ পুনঃ

শ্রবণের জন্য ব্যস্ত হইলেন। সত্যভামা প্রথম প্রথম নিজে আগ্রহ পূর্ব্বক শুনাইয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সুভদ্রা অর্জ্জুন-প্রসঙ্গ শুনিতে উৎসুক, তখন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুনের কথার উল্লেখ করিতে হইলে তাহা অতি অল্প কথায় শেষ করিয়া দেন। সুভদ্রার তাহাতে তৃপ্তি হয় না। অতৃপ্ত বাসনা মনকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলে।

সুভদ্রা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন—কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সখা বলিয়া সম্বোধন করেন, সখার মত ব্যবহার করেন। কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রতি ঠিক সখ্যভাব দেখাইতে পারেন না। তাঁহাদের সমপ্রাণতা থাকিলেও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক উর্দ্ধে আসন দিয়াছেন। অর্জ্জুন ভাবেন—শ্রীকৃষ্ণ—ভগবান, তিনি যেন তাঁহার ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ যতই অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিতে চাহেন, ততই যেন অর্জ্জুন তাঁহার চরণে পড়িতে ইচ্ছা করেন। এই ভাবটি সুভদ্রার মনে বড়ই ভাল

লাগিয়াছে—ইহাতে অর্জ্জুনের মনোভাবের সহিত স্বীয় মনোভাবের একতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুভদ্রার উদ্দেশ্য জগতে কৃষ্ণপূজা প্রচার করা। দ্বারাবতীতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রচার করিয়াছেন। দ্বারাবতীর বাহিরেও তাহা প্রচারের উপায় খুঁজিতেছিলেন। অর্জ্জুনের কৃষ্ণভক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছে—অর্জ্জুনের দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে। তবে তাঁহাকে উত্তেজিত করে কে? আজ নিকটে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি কথাও তাঁহাকে বলিতে পারিতেছেন না, কৃষ্ণভক্তি প্রচার সম্বন্ধে কোন অনুরোধ জানাইতে পারিতেছেন না। অর্জ্জুন দ্বারাবতী ত্যাগ করিলে, কৃষ্ণ ছাড়িয়া দূরে থাকিলে, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে কে? তখন সুভদ্রার প্রাণে অর্জ্জুনের সঙ্গে মিলনস্পৃহা জাগিল। ভদ্রার্জ্জুনের মিলন হইলে জগতে কৃষ্ণ-মহিমা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু এ মিলনের উপায় কি?

তখন সত্যভামার সমুদ্রতীরের মিলন ব্যাখ্যার কথা সুভদ্রার মনে পড়িল। অর্জ্জুনের পদধূলি গ্রহণ সময়ে তিনি হস্তে ধরিয়া বাধা দিতে সত্যভামা অমনি শঙ্খ বাজাইয়া "পাণিগ্রহণ" বলিয়া তামাসা করিয়াছিলেন। একদিন স্বেচ্ছায় দাদার নিন্দা করিয়াও অর্জ্জুনের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বড়বৌদিদির আশীর্ব্বাদের কথাও তাঁহার মনে হইল—"পতি-পুত্রবতী হও" সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামার সেই তামাসাও মনে পড়িল—"দিদির আশীর্ব্বাদ বৃথা হইবে না সুভদ্রা, শীঘ্রই তোমার মনের মত পতিলাভ হইবে।"

বড় বৌদিদি সেদিন বলিয়াছিলেন "বিবাহ নারীজীবনের প্রধান ধর্ম্ম। স্বামীর সঙ্গে মিলন ভিন্ন জীবনের পূর্ণতা হয় না। ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ণ ফল নাই। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং সহধর্ম্মিণী। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য। স্বামীর উপাসনা ভিন্ন দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন না।" ইহাই নাকি দাদার উপদেশ। তবে কি ভদ্রার

সাধনায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন? সত্যই কি তিনি এই ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী? বড় বৌদিদির কথা ত দাদার কথার প্রতিধ্বনি। তবে কি সত্য সত্যই বিবাহ করিতে হইবে? যদি বিবাহই করিতে হয়, তবে কাহাকে বিবাহ করা যায়?

তখন একটি একটি করিয়া সত্যভামার বর্ণিত অর্জ্জুনের গুণাবলী সুভদ্রার মনে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে অর্জ্জুন সুভদ্রার মত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহাকে পাইলে জগতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার অবশ্যম্ভাবী। ইহাই তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। যদি দাদা বিবাহ করিতে আদেশ করেন তবে অর্জ্জুনকেই বিবাহ করিবেন—আর যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করানই দাদার উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্জ্জুনের মূর্ত্তি দাদার মূর্ত্তির পাশে রাখিয়া তাঁহাকে পূজা করিবেন।

"দাদা, কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করি নাই। আজ, তোমার অসাক্ষাতে, তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া

তোমার সেবার সাহায্যের জন্য—অন্যের পদে বিক্রীত হইলাম। প্রভু ইহার ফলাফল তোমার হাতে।” এই বলিয়া নরনারায়ণের যুগল মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে স্থাপন করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন।
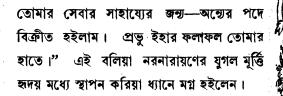
নবম অধ্যায়

বিবাহের মন্ত্রণা।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া বসুদেব জপ করিতে বসিয়াছেন। রোহিণী ও দৈবকী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিরতা। দৈনিক নিয়মানুসারে কৃষ্ণবলরাম আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য যাদবগণ আসিলেন, তাঁহারাও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে বসুদেবের ঘরে সম্মিলিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য অবধারণ করেন, আজও সেই উদ্দেশ্যে সকলে সমবেত হইয়াছেন। উপস্থিত প্রসঙ্গ সকল, প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও স্থিরীকৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে পিতা ও দাদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সুভদ্রার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

যদুবংশীয় সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"এখনই সুভদ্রার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সুভদ্রা যাহাতে উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয়, তাহাই আমাদের বাসনা।"

"আমারও তাহাই ইচ্ছা", ইহা বলিয়াই বলরাম কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। সুভদ্রার বিবাহের প্রস্তাব শুনিবা মাত্রেই বলরামের মনে এক নূতন চিন্তা প্রবেশ করিল। তিনি মনে মনে স্বীয় প্রিয়তম পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেই

প্রিয়-শিষ্য রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধনের কথা মনে হইল, অমনি তাঁহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ দাদার মুখের ভাব অবলোকন করিয়া শঙ্কিত হইলেন। দাদা কোন প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে লাগিলেন—

"আমার মতে অর্জ্জুন সুভদ্রার পক্ষে অতি উত্তম বর। এইরূপ বর দ্বিতীয় মিলিবার সম্ভাবনা নাই। যদি সকলের অভিমত হয় তবে আমি কল্যই তাঁহাকে সুভদ্রা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারি।"

এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র বসুদেব হইতে যদুবংশীয় বালক পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত সমর্থন করিয়া উঠিলেন। দৈবকী ও রোহিণী আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন "কৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণও আনন্দ প্রকাশ করিয়া যেন ইহা অনুমোদন করিলেন।

অর্জ্জুনের নাম শুনিয়া বলরাম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"কখনই নহে, কখনই নহে। আমি

কিছুতেই পাণ্ডবদিগের করে ভগ্নী সম্প্রদান করিব না। আমার প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধনকে ভগ্নী সম্প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। শীঘ্রই সে দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়া সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমরা সকলে সেই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও।"
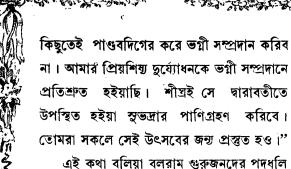
এই কথা বলিয়া বলরাম গুরুজনদের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। আর কাহারও কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না। যদুবংশীয়-গণ বলরামের কথার প্রতিবাদ করিয়া দুর্য্যোধন সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের ব্যবহারের সমালোচনাও করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মন্তব্যে বাধা জন্মাইয়া কহিলেন,—"দেখ, শত হইলেও তোমরা বালক, দাদার সিদ্ধান্তের উপর তোমাদের কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ সঙ্গত নহে। মাতাপিতা ভিন্ন তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তিনি যখন তোমাদের অভিমতের অপেক্ষা করেন নাই,

তখন তোমাদের নীরব থাকাই ভাল।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য যাদবগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বসুদেব, রোহিণী ও দৈবকী বলরামের পণে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন।

---*---
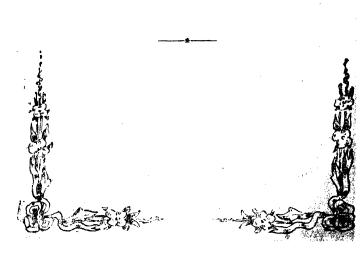
দশম অধ্যায়

উপায়।

বলরামের পণ, দ্বারাবতীতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সত্যভামা, অর্জ্জুন ও সুভদ্রা ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন। এখন উপায় কি?

অর্জ্জুন, সুভদ্রার জন্য উন্মত্ত। স্বয়ং সত্যভামার নিকট সুভদ্রাকে পাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাণসখা কৃষ্ণকে বলিতে সাহস পান নাই, লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। "নিশ্চয়ই তোমাকে সুভদ্রা দান করিব—" সত্যভামা এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়াছেন। অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য, কৃষ্ণ বাক্যের প্রতিধ্বনি বলিয়াই বিশ্বাস করেন; সে আশ্বাস বাক্যে অর্জ্জুন আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি দিবারাত্রি সুভদ্রা-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, স্তোত্র স্বরূপ তাঁহার গুণাবলী আলোচনা করিতেছেন। "অসামান্য রূপগুণের

আধার সুভদ্রা তাঁহারই হইবে” মনে মনে এই কল্পনা করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন।

উদাসিনী সুভদ্রার প্রাণে এখন নূতন ভাব জাগিয়াছে। তিনি যেন প্রাণে প্রাণে কি একটা অভাব অনুভব করিতেছেন। যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া সুভদ্রা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, এখন তাহাতে আর তিনি মুগ্ধ হইতে পারেন না—সঙ্গে যেন অপর কেহ একজন থাকিলে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেন। নারায়ণের আরতি করিতে যান—আরতি তেমন প্রানস্পর্শী হয় না। দক্ষিণ পার্শ্বে আর কেহ থাকিলে—যেন উভয়ে মিলিয়া আরতি করিলে ভাল হইত। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই যেন সুভদ্রার প্রাণের ভিতর কি একটা অভাব অনুভূত হইতেছে। সদা-হাস্যময়ী সুভদ্রার ভিতরে একটু বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। ইহা যে অর্জ্জুনের অভাব জনিত সত্যভামা তাহা বুঝিয়াছেন। সুভদ্রার মনের ভাবও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে

সত্যভামা, সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত; অপর দিকে বলরাম সুভদ্রাকে প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিতে বদ্ধ-পরিকর। এখন উপায় কি?

সত্যভামা, করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন—"প্রভু, তোমার আদেশেই সুভদ্রার্জ্জুনের মিলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। উভয়কে মিলনোন্মুখ করিয়াছি। এখন এ বিভ্রাট কেন? তুমি কি ইহার কোন প্রতিবিধান করিবে না।" সত্য-ভামা এই বলিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতেছেন।

যে সত্যভামা, সুভদ্রাকে মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, আজ তিনি তাঁহাকে আদৌ দেখিতে যান নাই। তিনি অর্জ্জুনকে প্রতিদিন আশ্বাস দিয়া প্রলোভিত করিয়াছেন, অর্জ্জুন তাঁহার মুখে সুভদ্রাগুণ শুনিয়া মুগ্ধ, সুভদ্রা পাইবার আশায় আশ্বাসিত, আজ সেই অর্জ্জুনের সঙ্গেও দেখা করেন নাই।

যদি বলরামের পণই ঠিক থাকে, তবে

সুভদ্রা সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে। একাকী অর্জ্জুন কুরুকুল যদুকুল নির্ম্মূল করিবে; রক্ত স্রোতে দ্বারকা রঞ্জিত হইবে, সমুদ্রের নীল জলেও লোহিত আভা বিস্তার করিবে। ইহার প্রতি-বিধানের কোন উপায় নাই কি ?

প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি নিশ্চিন্ত; দাদার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। হাসি মাখা মুখে বলেন—

"সুভদ্রা বীরের বীরত্বের পুরস্কার! অর্জ্জুনের ক্ষমতা থাকিলে, অবশ্যই সে সুভদ্রা গ্রহণে সমর্থ হইবে।"

তিনি যেন ইঙ্গিতে বলেন—অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক সুভদ্রা গ্রহণ করুক। এখন অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করিলেও আত্মবিচ্ছেদে যদুবংশ ধ্বংস হইবে। দুর্য্যোধনকে সুভদ্রা দান করিলেও অর্জ্জুন কুরু-বংশ ও যদুবংশ ধ্বংস করিতে পারে। উপায় কি ? সুভদ্রা মরিলে কি ইহার শান্তি হয় ? সে আত্ম-

ত্যাগী উদাসিনী, যদিও প্রেমের স্বাদ পাইয়াছে —মনের মানুষ দেখিয়াছে, তথাপি স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই আত্ম ত্যাগ করিবে। তাহাতে কি হইবে? যদুবংশে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিবে। আর অর্জ্জুন কি শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইবে? যাঁহারা তাঁহার সুভদ্রা লাভের অন্তরায়, তাঁহাদিগকে কি জীবিত রাখিবে? অসম্ভব। অর্জ্জুন এখন সুভদ্রাগত প্রাণ, সুভদ্রার সঙ্গে সে যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেনা, তাহাই বা কে বলিবে?

সত্যভামা এইরূপ অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক ভাবনা ভাবিলেন। সকল দিক রক্ষা হয়, এমন কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—স্বয়ং সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের করে আজই অর্পণ করিব। কাল অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করুক। ইহাতে যদুকুলের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে।

সত্যভামা এই সঙ্কল্প করিয়া সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন।
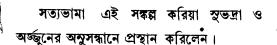
একাদশ অধ্যায়

সম্প্রদান।

সুভদ্রা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী—সুভদ্রা সংযমে আদর্শ স্থানীয়া। এতদিন অর্জ্জুনের প্রতি অনুরাগ, তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। বাহিরে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। সত্যভামাও তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এই মাত্র বুঝিয়াছেন—সুভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি অনুরাগিণী। তাহাকে কখনও বিমর্ষ দেখিলে পরিহাসচ্ছলে

বলিতেন—"আমি শীঘ্রই তোমাকে অর্জ্জুনের সঙ্গে মিলন করাইয়া সুখী করিব।"

বলরামের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সুভদ্রার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ তাঁহার অন্তঃসলিলা জলস্রোত নয়ন কোনে প্রবাহিত হইতেছে। অশোক তরুমূলে বসিয়া ভাবিতেছেন—"এখন উপায় কি? যে হৃদয় অর্জ্জুনের পদে সমর্পণ করিয়াছি, যে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অর্জ্জুনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, সেই মূর্ত্তি উৎপাটন করিয়া অন্যমূর্ত্তি কিরূপে বসাইব। নারীধর্ম্মবিগর্হিত কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। সে জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাও স্বীকার। এত দিন মনে মনে ভয় ছিল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া বুঝি অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সর্ব্ববিষয়ে অর্জ্জুনকে আমার উপযুক্ত বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আর সে ভয় নাই। তিনি অন্তর্য্যামী আমার অন্তরের ভাব জানিয়াই তিনি সে প্রস্তাব করিয়াছেন।

কিন্তু আজ যে তিনি নীরব। আমার কাতর ক্রন্দনে কি তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে না ? তিনি ইচ্ছাময়! —তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। দাদা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না।
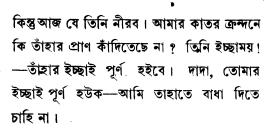
আমি বড় দাদার আদেশই বা লঙ্ঘন করিব কেমন করিয়া ? দাদা যাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন না, আমি সে কথার কেমনে প্রতিবাদ করিব ? না, যাই বড় দাদার চরণে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিব।” এই বলিয়া সুভদ্রা চলিলেন ; এমন সময়ে সত্যভামা আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া বলিলেন—“কোথা যাও সুভদ্রা ?”

“বড় দাদার পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতে— তিনি যেন আমার ব্রহ্মচর্য্যায় বাধা না জন্মান।” সুভদ্রা ধীর ভাবে এই কথা বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সত্যভামা বলিলেন—“তিনি যদি সে ভিক্ষা না দেন ?”

"দিবেন—অবশ্য দিবেন। জান ত বৌদিদি বড়দাদা আমাকে কত স্নেহ করেন, আমার কত আবদার রাখেন। বড়দাদার ক্রোধ শান্তির একমাত্র উপায় আমি। যে দিন ক্রোধে প্রলয় ঘটাইতে প্রস্তুত হন, দ্বারাবতীর সকলে ভয়ে কম্পবান থাকেন, সে দিন ত আমারই আবদারে সে ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে। আজ তাঁহার পায়ে ধরিব, ভিক্ষা চাহিব, আর কিছু নয় তাঁহার মুখের একটি কথা—"তুমি চিরকুমারীই থাক।"

সুভদ্রা এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন। সত্যভামা আবার বলিলেন—"যে পণ, পিতা বসুদেব, মাতা রোহিণী ও দৈবকী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও ভাঙ্গিতে পারেন নাই—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়াছে—সেই কথা নিয়া তুমি কোন্ সাহসে যাইতেছ ? আর তোমাকে না হয় সম্মতি দিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন যে সদল বলে আসিতেছেন, তাঁহাকে ফিরাইবেন

কি বলিয়া ? দুর্য্যোধনই বা সহজে ফিরিবেন কেন ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথী তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন ; তখন যাদবদের অবস্থা কি হইবে ভাবিয়াছ কি ? তুমি বিবাহ করিলে না, অর্জ্জুন—যে তোমার জন্য মরিতে বসিয়াছে, তাঁহার উপায় হইবে কি ?"

তখন সুভদ্রা ব্যাকুল ভাবে বলিলেন—"আমি অর্জ্জুনও চাহিনা—দুর্য্যোধনও চাহিনা, আমি চাহি—যেরূপ আছি সেইরূপ থাকি। বড় দাদা তাঁহার শিষ্য দুর্যোধনকে বুঝাইয়া বিদায় দিবেন আর তোমরা তোমাদের সখাকে বুঝাইয়া বিদায় কর। যদুবংশের সকল বিপদ দূর হউক, আমি আমার ব্রহ্মচর্য্যা নিয়া থাকি।"

"অর্জ্জুনের জন্য অশ্রুপাত দূর হইবে কিসে ?" সত্যভামার এই কথার উত্তরে সুভদ্রা বলিলেন—"যদুবংশের সম্মান রক্ষার জন্য এ অশ্রু ত সামান্য, তুষানল ব্যবস্থাও সহ্য করিতে পারিব। অর্জ্জুনকে পাইবার আশা ত ভোগ

বিলাসের জন্য নহে। অর্জ্জুনের সঙ্গে মিলন ধর্ম্ম কর্ম্মের পূর্ণতা লাভের জন্য—আর কৃষ্ণ পূজা প্রচারে সাহায্য পাইবার জন্য। অর্জ্জুনকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—এ হৃদয়ে অন্য মূর্ত্তি স্থান পাইবে না সত্য—আমি আমরণ দাদার দেবমূর্ত্তির পাশে, ঐ নরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, যুগল নর-নারায়ণের পূজা করিয়া শান্তি লাভ করিব।"

"তুমি ত শান্তিলাভ করিবে সুভদ্রা! আমার উপায় কি হইবে?" এই কথা বলিতে বলিতে সহসা অর্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। সত্য-ভামাকে দেখিয়া বলিলেন "আঃ বৌদিদি যে, আজ আমার সুপ্রভাত!—মেঘের সঙ্গেই জল।

"মেঘের জল আর পান করিতে হইবে না, বজ্রের ভয়েই পলাইতে হইবে। দুর্য্যোধন সদল বলে বজ্ররূপে আসিতেছেন।" এই বলিয়া সত্যভামা অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—সেই মুখের প্রফুল্লতা আর নাই,

চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ, শরীর শীর্ণ—নিরাশায় প্রাণ যেন অবসন্ন হইয়াছে।
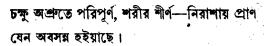
অর্জ্জুন উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"সুভদ্রা যদি সত্যসত্যই আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, ও সখা শ্রীকৃষ্ণের যদি ইহা অনুমোদিত হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী একত্রিত হইলেও অর্জ্জুনের কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইবে না।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কাতরনয়নে সুভদ্রার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সুভদ্রা, ইতি পূর্ব্বে বৌদিদিকে যাহা বলিয়াছ তাহা কি সত্য ?"

সুভদ্রা অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে অর্জ্জুনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ছিলেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নে, সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যেন বীণাধ্বনি আরম্ভ হইল—লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আপনার পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমাকে পাইবার আশা মুহুর্ত্তের জন্যও আপনার হৃদয়ে সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তাহা ভুলিয়া যান। যদুবংশের মঙ্গল বিধান করুন।"

"সুভদ্রা, আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত না হইলে সুভদ্রা-প্রাপ্তির আশা ভুলিতে পারিব না। আর আমিই নাহয় তোমার অনুরোধে ভুলিয়া—তোমারই মত, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে সুভদ্রা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মানসপটে পূজা করিলাম—কিন্তু দুর্য্যোধন ভুলিবে কেন? সে যদি যদুবংশের অমঙ্গল বিধান করে, তখন কি হইবে?" এই বলিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রার মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিলেন। সুভদ্রা আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বৌদিদি, বৌদিদি, তবে যদুবংশ রক্ষার উপায় কি হইবে?"

সত্যভামা বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যখন তিনি স্বয়ং প্রস্তাব করিয়াছেন—অর্জ্জুনকে সুভদ্রা দান করিবেন, তখন সমস্ত পৃথিবী রসাতলে গেলেও তাহার অন্যথা হইবে না। ইহাতে যদুবংশের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।"

তখন অর্জ্জুন উৎসাহের সহিত বলিলেন—"যদি ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বৌদিদি, তবে আর

যদুবংশের ভয় কি? সমস্ত পৃথিবী সমবেত হইলেও কেহ যদুবংশের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কুরুকুল ত তুচ্ছ কথা।"

অর্জ্জুনের বীরগর্ব্বে সুভদ্রা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—এবং কাতর প্রাণে বলিলেন—"আপনার এই বীরত্বই যে যদুবংশের কাল হইবে। আপনার বাণাঘাতেই যে যদুকুল নির্ম্মূল হইবে।

"সে আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও করিও না সুভদ্রা! শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি দিলে, এখনই তোমাকে লইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতে পারি। কৃষ্ণ ভিন্ন, সমস্ত যদুকুল আমাকে আক্রমণ করুক—আমি হাসিতে হাসিতে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া প্রস্থান করিব। তাহাতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিব না। আমি এই গাণ্ডীব স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যাদবের এক-বিন্দু রক্তেও ভূমি রঞ্জিত হইবে না।"

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞায় সুভদ্রা ও সত্যভামার

মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সত্যভামা বলিলেন —"তাহাই ঠিক। আগামী কল্য তোমার মৃগয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের রথ প্রস্তুত থাকিবে। তুমি রথসহ রৈবতকের বাহিরে অবস্থান করিও। আমরা সুভদ্রা সহ রৈবতক প্রদক্ষিণ করিয়া যখন রৈবতকের বহির্দ্দেশে যাইব, তখন তুমি সুভদ্রাকে তোমার রথে উঠাইয়া প্রস্থান করিবে। প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিও—যাদবের এক বিন্দু রক্তেও যেন পৃথিবী রঞ্জিত না হয়।" এই বলিয়া সত্যভামা অর্জ্জুনের দক্ষিণ হস্তের উপর সুভদ্রার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন —"অর্জ্জুন, আজ আমার বুকের ধন, বুক ছিঁড়িয়া তোমার করে সমর্পণ করিলাম। দেখিও ইঁহার যেন অযত্ন না হয়।"

"বৌদিদি, কৃষ্ণাদেশ ভিন্ন একার্য্যে কখনও সম্মত হইতে পারি না।" এককালে ভদ্রার্জ্জুন উভয়েরই মুখ হইতে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি

হইল—এক বীণার দুই তারে যেন একই সুরের ঝঙ্কার দিল।

"আর আমি বুঝি শ্রীকৃষ্ণের কিছুই না? আমার বাণী কৃষ্ণাদেশের প্রতিধ্বনি বলিয়া জানিবে।" এই বলিয়া সত্যভামা প্রীতি-গর্ব্ব-দীপ্ত নয়নে উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

তখন ভদ্রার্জ্জুন "তথাস্তু" বলিয়া সত্যভামার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের প্রাণে যেন অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। সত্যভামাও তাঁহাদিগকে স্নেহাশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট করিয়া সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।
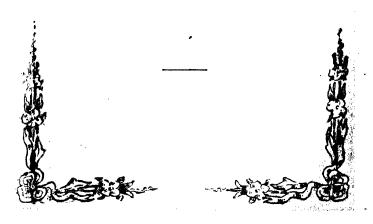
দ্বাদশ অধ্যায়

অপূর্ব্ব-সারথি।

সত্যভামার উপদেশ মত অর্জ্জুন রথসহ রৈবতক-প্রান্তে উপস্থিত রহিয়াছেন। যাদবীগণ সহ সুভদ্রা রৈবতকের অর্চ্চনান্তে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা অর্জ্জুন রক্ষিগণ পরিবেষ্টিত যাদবীগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুভদ্রার হস্ত ধারণ করিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া রথে উঠিলেন। সুভদ্রা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

সুভদ্রাকে এইরূপ ভাবে অর্জ্জুনের রথে উঠিতে দেখিয়া, যাদবীগণের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। "অর্জ্জুন সুভদ্রাহরণ করিতেছে" বলিয়া একটা রোল উঠিল। রক্ষীগণ অর্জ্জুনকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল। দ্বারকায় সংবাদ গেল।

রক্ষীগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলে—অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে যাদব-কুমারগণ নারায়ণীসেনা সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহবান করিলেন, এবার দারুক বিপদে পড়িলেন। কৃষ্ণপুত্রদের বিরুদ্ধে কি প্রকারে রথ চালনা করিবেন? অর্জ্জুনের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্বেও যখন দারুক রথ ফিরাইতে সম্মত হইলেন না, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে পাশ অস্ত্রে রথস্তম্ভে বন্ধন করিলেন, এবং স্বয়ং, এক পদে অশ্বরজ্জু ও অপর পদে কষা ধারণ পূর্ব্বক যাদবগণের দিকে রথ চালনা করিলেন। তখন উভয় হস্তে বাণবর্ষণে যাদবগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি বাণও কাহারও শরীরে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন না।

অর্জ্জুন স্বয়ং রথী, স্বয়ং সারথী। এইরূপ অবস্থায় অসংখ্য যাদবসৈন্যের আক্রমণ হইতে অর্জ্জুনের আত্মরক্ষা করা একটুকু অসুবিধা জনক

দেখিয়া সুভদ্রা অর্জ্জুনের চরণযুগল হইতে অশ্বরজ্জু ও কষা গ্রহণ করিয়া সারথির আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি এমন কৌশলে রথ চালনা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুনকে আত্মরক্ষা করিতে আর কোন কষ্টই পাইতে হইল না। রথ এমন ক্ষিপ্রগতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, যে, যাদবগণ লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলেন না। অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বাণক্ষেপণ করিতে করিতে তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাদের তূণ শূন্য হইল। তাঁহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা অর্জ্জুনের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের শরনিক্ষেপ-কৌশলে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন অসংখ্য বাণবৃষ্টি করিয়া কেবল মাত্র তাঁহাদের আক্রমণে বাধা জন্মাইতেছেন, কিন্তু একটি বাণেও কাহাকে বিদ্ধ করিতেছেন না। তখন তাঁহারা মনে করিলেন— অর্জ্জুন অদ্বিতীয় বীর, তিনি শত্রুভাবে আক্রমণ

করিলে তাঁহাদের অধিকাংশ সৈন্য বিনাশ করিতে পারিতেন। শত্রুতা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তিনি কেবল মিত্রভাবেই তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্গত কিনা, সে বিষয়ে রামকৃষ্ণের অনুমতি লওয়া উচিত। এই মনে করিয়া সাত্যকি স্বয়ং কৃষ্ণবলরামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্ব হইতেই সাত্যকির মনে সন্দেহ হইতেছিল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্জ্জুন কখনও সুভদ্রা হরণ করেন নাই। অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধ। চক্রধারীর কূটচক্রেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহারা বলরামের আদেশে যুদ্ধে আসিয়াছেন, বলরাম যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তাঁহাদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে, দেখিয়া সাত্যকি ভাবিলেন যে হয়ত শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবাহ।

বলরাম যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অপমানে, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। অর্জ্জুন তাঁহার ভগ্নীহরণ করিয়াছে, যদুকুলে কলঙ্ক দিয়াছে—কোন্ প্রাণে তাহা সহ্য করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লোক গিয়াছে, কিন্তু লোকও ফিরিতেছে না—শ্রীকৃষ্ণও আসিতেছেন না। ভ্রাতার ব্যবহারে বলরাম আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। হলধর হল ফেলিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া পড়িলেন।

ধীরভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দাদার পদধূলি লইলেন। করযোড়ে বলিলেন—"দাসের প্রতি কি অনুমতি হয় ?"

ক্রোধ কম্পিতস্বরে বলরাম বলিলেন—"এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ—কি অনুমতি হয়? দুগ্ধ দিয়া যে কালসর্প পুষিয়াছিলে, তাহার বিষ-দংশন কি তুমি এখনও অনুভব করিতে পার নাই? তোমার প্রাণসখা যে কুল কলঙ্কিত করিয়া প্রাণের ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে, তাহা কি শুন নাই? তাহার প্রতিফল না দিয়া কি অপমানের ডালা শির পাতিয়া লইতে হইবে? চক্রধর, শীঘ্র চক্র ধর।" বলরামের কথা শেষ হইতে না হইতেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সাত্যকি দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শশব্যস্তে কহিলেন—"সাত্যকি যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণন কর।"

প্রণাম করিয়া সাত্যকি করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, এমন অদ্ভুত যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে, কিন্তু এক বিন্দুও রক্তপাত নাই। অর্জ্জুন কেবল মাত্র আত্মরক্ষা করিতেছেন, কাহাকেও বাণবিদ্ধ করিতেছেন না।

অথচ আপনার নারায়ণী সেনা ও কুমারগণ যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুতেই আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আপনাদের অনুমতির জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা যে—আপনার ভগ্নী সুভদ্রা দেবী অর্জ্জুনের রথে সারথির আসনে বসিয়া রথ চালাইতেছেন। এমন রথ-চালন-কৌশল আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিনাই। রথ বিদ্যুৎবেগে সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, কখন্ কোন্ দিকে যাইতেছে, কেহ লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। কখন বা মেঘের আড়ালে থাকিয়া বিদ্যুতের খেলা খেলিতেছে, কখন বা উল্কা পিণ্ডের ন্যায়, নয়ন ধাঁধিয়া, এক প্রান্তে আবির্ভূত ও প্রান্তান্তরে তিরোহিত হইতেছে। এই রথ চালনার কৌশলেই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কেহ বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না।

সুভদ্রার অদ্ভুত রথচালনার কথা শুনিয়া বলরাম আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। ভগ্নীর
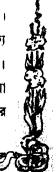
গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। প্রাণে যেন তাঁহার অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্জ্জুন রথ পাইল কোথায়?" সাত্যকি কহিলেন—"সুগ্রীবাদি হয়যুক্ত ভগবানের রথ।"

তখন বলরাম উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"আমি বুঝিয়াছি এই সকলই তোমার চতুরতা। আমার বাসনা ব্যর্থ করিবার জন্যই তোমার এই কৌশল। তুমি নিজের রথ অর্জ্জুনকে দিয়া ভগ্নী হরণে উপদেশ দিয়াছ। এখন কোন্ মুখে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে? তজ্জন্যই নীরব হইয়া রহিয়াছ। আমাকে এইরূপ ভাবে অপমান করিবার কি আবশ্যক ছিল?" এই বলিয়া বলরাম কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"না আমারই ভুল হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্ব্বথা পূর্ণ হয়, ইহা জানিয়াও তাহার অন্যথা করিতেছিলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন করযোড়ে বলিলেন—ইহাতে আমার কোন দোষ নাই দাদা; আমার রথে অর্জ্জুন সর্ব্বদাই ভ্রমণ করেন। আজ সেই ভাবেই গিয়াছেন। আমার নিকট তাঁহার জিজ্ঞাসা করিবারও আবশ্যক হয় নাই। আমি ইহা জানিও না। যদি আমার অনুমতিতেই রথ গ্রহণ করিবে, তবে দারুকই নিজে রথ চালাইত; সুভদ্রার রথ চালনার প্রয়োজন হইত না।

তখন বলরাম আগ্রহের সহিত সাত্যকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারুক কোথায়?" সাত্যকি উত্তর করিলেন—"দেখিলাম—তিনি রথ দণ্ডের সহিত বন্ধন দশায় অবস্থিত।"

"তখন শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহের সহিত বলিলেন—ইহাতেই বুঝিতে পারেন— আমার কোন দোষ নাই। আমার অনুমতি পাইলে দারুক কখনও বন্ধন দশায় থাকিত না। এই ঘটনা হইতে আমি ইহাই বুঝিতেছি—সুভদ্রা অর্জ্জুনে অনুরক্ত, দুর্য্যোধনের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে সতীত্ব

নাশের আশঙ্কায়, অর্জ্জুনকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়-বিধি অনুসারে অনুরক্তা কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। ইহাতে অর্জ্জুনেরই বা দোষ কি? সুভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি অনুরক্তা না হইলে যাদবগণের বিরুদ্ধে স্বয়ং অর্জ্জুনের রথচালনা করিতেছে কেন?" যখন এই সকল কথা হইতেছিল, তখন বসুদেব, দৈবকী, রোহিণী প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"রামকৃষ্ণ! এখন উপায় কি?"

শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে বলিলেন—"সুভদ্রা উপযুক্ত পাত্রেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণ করিয়া পলায়ন করেন নাই। তিনি ধীরভাবে জানাইতেছেন—সুভদ্রা আমার প্রতি অনুরক্তা—আমিও তাঁহাকে পাইবার যোগ্য। এক দিকে বিশাল নারায়ণী সেনা অপর দিকে একাকী অর্জ্জুন। এইরূপ যুদ্ধেও অর্জ্জুন পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। তাঁহার

অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনীত স্বকর্ণেই শুনিলেন।”

অর্জ্জুনের বীরত্বের কথা শুনিয়া রোহিণী ও দৈবকী ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—“হায়, হায়, না জানি কুমারগণের কি দুরাবস্থাই হইয়াছে।”

শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিয়া বলিলেন—“না মা, অর্জ্জুন যদুবংশের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করেন নাই। অর্জ্জুন শত্রুতা সাধন করিলে এত ক্ষণে যদুবংশ নির্ম্মূল করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। অর্জ্জুন তোমাদের কুমার-গণের শরীরে একটি বাণও বিদ্ধ করেন নাই। তোমাদের নারায়ণী সেনার একবিন্দু রক্তও রণক্ষেত্রে পতিত হয় নাই।

অর্জ্জুন অদ্বিতীয় বীর এবং যাদবের অকৃত্রিম বন্ধু। আমি এখনও প্রস্তাব করিতেছি, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া অর্জ্জুনকে সাদরে আহ্বান করতঃ তাঁহার আশ্চর্য্যজনক বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ সুভদ্রাকে দান করা হউক। তখন সকলেই

বীরত্ব ও মিত্রতায় সন্তুষ্ট হইয়া যাদবগণের ক্রোধ ও অভিমান দূর হইলেও, বলরামের হইল না। কিন্তু উপায় নাই—ভগ্নী যখন স্বেচ্ছায় অর্জ্জুনকে আত্মদান করিয়াছে, তখন বলপূর্ব্বক তাহাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া, ভগ্নীর প্রতি নারীধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। অগত্যা বলরাম সম্মত হইয়া বলিলেন—“অর্জ্জুনের বীরত্বের ও মিত্রতার পুরস্কার স্বরূপ আমি নিজে তাঁহাকে ভগ্নী দান করিব।” এই বলিয়া ভদ্রার্জ্জুনকে আনিবার জন্য সাত্যকিকে প্রেরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন বরবেশে সজ্জিত হইয়া সসৈন্যে সেনাপতিবৃন্দের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি অর্জ্জুন ও যাদবের যুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন! অধিকতর বিস্মিত হইলেন—সুভদ্রার রথ চালনায়। দুর্য্যোধনের পরামর্শে কর্ণ, অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়া সুভদ্রা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ভীম গদাহস্তে তাঁহার পথরোধ করিলেন। এই রূপ ঘটনা যে ঘটিবে, ভীম তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতির জন্য ইতি পূর্ব্বেই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভীম দুর্য্যোধনের সঙ্গে সসৈন্যে বরযাত্রী রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কুরুসৈন্যগণ, যাদবসেনার সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুনের বিস্ময়কর বাণবর্ষণে কুরুসেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় সাত্যকি আসিয়া যদুবংশীয়দিগকে যুদ্ধে বিরত রাখিয়া, স্বয়ং নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন।

সাত্যকিকে দেখিয়া সুভদ্রা বড়ই লজ্জা পাইলেন, এবং সারথির আসন ত্যাগ করিয়া রথের কোণে লুকাইলেন। অর্জ্জুন দারুকের

বন্ধন মুক্ত করিয়া দ্বারাবতীতে রথ চালাইতে অনুমতি দিলেন।
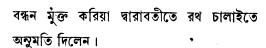
যাদবদিগকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রা লাভ করিলেন—দুর্যোধন নিরাশ-হৃদয়ে হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের রথ দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইলে, স্বয়ং বলরাম তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইল। এইরূপে যাদব ও পাণ্ডব মিলনে উভয় পক্ষই আনন্দিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ইন্দ্রপ্রস্থ।
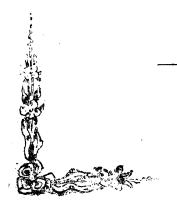
অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বিধিলঙ্ঘন জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রভাস তীর্থে তাঁহার দ্বাদশবর্ষ সম্পূর্ণ হইল। সেখান হইতে **তিনি** দ্বারাবতীতে ফিরিয়া সখা কৃষ্ণের সহিত পুনার্ম্মিলিত হইলেন। অর্জ্জুনকে পাইয়া দ্বারাবতীতে আবার আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল।

দুই বৎসর অদর্শনের পরে স্বীয় আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইয়া, সুভদ্রা আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। "এতদিনে আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল, আরাধ্য দেবতা দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।" এই বলিয়া সুভদ্রা অর্জ্জুনের চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণ যুগল মস্তকে লইয়া চরিতার্থ হইলেন।

অর্জ্জুন সস্নেহে সুভদ্রাকে তুলিয়া বামপার্শ্বে বসাইলেন। তখন দুই বৎসর, কে, কি ভাবে

কাটাইয়াছেন, তাহা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

বহুদিন হইল অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাতা ও ভ্রাতাদের অদর্শন জনিত দুঃখ তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছে। সত্যভামা পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার আশায় অর্জ্জুন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিলেন। নিজেও তাঁহাদের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সুভদ্রাসহ কৃষ্ণার্জ্জুনের আগমনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া, মহাসমারোহে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিয়া সুভদ্রা মুগ্ধ হইয়াছেন। সেই স্থানটি যেন তাঁহার মনের মত। একমাত্র

অর্জ্জুনের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়াই তাঁহাকে কৃষ্ণপূজা প্রচারের সহায় মনে করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া দেখিলেন, যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জুনের অপেক্ষাও বেশী। অন্যান্য ভ্রাতৃগণও সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিরত। আর দ্রৌপদীর কৃষ্ণ ভক্তির তুলনা নাই। সুভদ্রা বুঝিতে পারেন না, ইঁহারা এমন কৃষ্ণ ভক্ত কেমন করিয়া হইলেন। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—আমি বাল্যকাল হইতে যাঁহার নিকট থাকিয়া শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া, যাঁহাকে দেবতা বুঝিয়া পূজা করিয়াছি, তাঁহাকে আমি যতটুকু চিনিতে না পারিয়াছি—ইঁহারা এত দূরে থাকিয়াও অতি অল্প দিন তাঁহার সাক্ষাৎপাইয়া, এইরূপ ভাবে চিনিলেন কেমনে? ইহা ভাবেন আর আনন্দ-সাগরে মগ্ন হন। যিনি দ্বারকার বাহিরে কৃষ্ণপূজা প্রচারের সাহায্য পাইবেন বলিয়া অর্জ্জুনকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তিনি দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতেই জগতে প্রচারিত

হইয়াছেন। এই কথা ভাবেন—আর তাঁহার ভক্তির অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়! তখন করযোড়ে প্রার্থনা করেন—"দাদা, তোমার বিষয় আমাকে কিছু জানিতে দাও নাই। অন্যকে যাহা দিয়াছ, আমাকে তাহাতে কেন বঞ্চিত রাখিয়াছ?"

পাণ্ডব-পুরে সুভদ্রার কৃষ্ণভগ্নী বলিয়া যত আদর, অর্জ্জুনের স্ত্রী বলিয়া তত আদর নাই। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রাকে কৃষ্ণের মত শ্রদ্ধা করেন—কুন্তী কন্যার মত স্নেহ করেন—আর দ্রৌপদী—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিটুকু তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হন। কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রা সকল বিষয়েই ইন্দ্রপ্রস্থের সকলেরই মন অধিকার করিয়াছেন। কেহ তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় মুগ্ধ—কেহ তাঁহার কৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ—কেহ তাঁহার স্নেহ মমতা দেখিয়া—কেহবা তাঁহার অসাধারণ দয়া দেখিয়া মোহিত। ইন্দ্রপ্রস্থের সকলেই সুভদ্রার অনুগত। এমন কি স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি ধর্ম্মরাজের মনও আকর্ষণ

করিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণের পরামর্শ পাইবার সুবিধা না থাকে, তখন ধর্ম্মরাজ গুরুতর বিষয়ে কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার পরামর্শই গ্রহণ করেন।
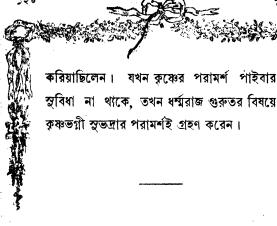
পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞ।

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পরামর্শ দিলেন। যুধিষ্ঠিরও, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই যজ্ঞ সম্পাদনের সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী না হইলে কেহ এই যজ্ঞ করিতে পারেন না। তখন জরাসন্ধ ভারত সম্রাট ছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম জরাসন্ধকে বধ করিলেন। চারি ভাই চারিদিকে দিগ্বিজয় করিয়া সমস্ত

রাজগণকে অনুগত করিলেন। সকলেই যুধিষ্ঠিরকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মহাসমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যুধিষ্ঠির ভারতের একছত্র সম্রাট হইলেন।

যজ্ঞের নিয়মানুসারে উপস্থিত জনগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে যজ্ঞের অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শিশুপাল প্রভৃতির আপত্তি সত্বেও, শ্রীকৃষ্ণকে সেই অর্ঘ্য প্রদান করিয়া জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সুভদ্রার মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল এবং তাঁহার আজীবনের কামনা এত অল্পায়াসে সিদ্ধ হইল দেখিয়া, পাণ্ডবদের চরণে চিরবিক্রীত হইয়া রহিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞে ঈর্ষা-পরায়ন দুর্য্যোধন, পণবদ্ধ অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধন সমস্ত জয় করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ বনে গেলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রাকে

দ্বারাবতীতে লইয়া গেলেন। তখন সুভদ্রা একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন—তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "অভিমন্যু।" অভিমন্যুকে সুভদ্রা পালন করেন—মাতুল শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শিক্ষা দেন —বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষায় অতি অল্প বয়সেই অভিমন্যু জগতে অদ্বিতীয় বীর হইলেন। না হইবেনই বা কেন? যাঁহার পিতা অর্জ্জুন, মাতা সুভদ্রা, মাতুল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি জগতে অদ্বিতীয় বীর হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের সময় ছদ্মবেশে বিরাট রাজ্যে বাস করিতে ছিলেন। অর্জ্জুন স্ত্রী-বেশে বৃহন্নলা নামে, বিরাট রাজ দুহিতা উত্তরার শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যখন তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করিলেন—বৃহন্নলাকে অর্জ্জুন জানিয়া, বিরাটরাজ উত্তরাকে বিবাহ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিলেন। অর্জ্জুন কন্যার ন্যায় তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, এই জন্য

উত্তরাকে নিজে গ্রহণ না করিয়া, পুত্র অভিমন্যুর সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। দ্বারাবতী হইতে কৃষ্ণ, অভিমন্যুসহ বিরাট রাজ্যে আসিলেন। মহাসমারোহে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হইল। পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব রাজ্য প্রাপ্তির বিষয়ে নানারূপ উপদেশ দিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যু ও উত্তরা সহ দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। যখন বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র ভূমি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন,—তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় রহিল না। পাণ্ডব গণ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাদবগণ মহাসমারোহে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। সুভদ্রা পুত্র ও পুত্রবধূকে পরম যত্নে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মনে শান্তি পাইলেন না, অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার জন্য উৎকন্ঠিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার বিরাট নগরে যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অভিমন্যু, উত্তরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

সুভদ্রা যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন—"দাদা, সম্মুখে ভীষণ ভারত যুদ্ধ উপস্থিত, এসময়ে তোমার আশ্রিতদিগকে ভুলিয়া থাকিওনা।"

"তোমরাও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে ভুলিওনা" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

আশ্রয় দান।

সুভদ্রা বিরাট রাজ্যে যাইতেছেন। পথে গঙ্গাস্নানান্তে দেখিলেন—এক রাজা বৃক্ষশাখায় অশ্ব বাঁধিয়া গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যেমন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন—অমনি সুভদ্রা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আত্মহত্যা মহা পাপ—কেন্ আপনি পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?"

সুভদ্রার মুখে স্নেহ মাখা সদুপদেশ শুনিয়া দণ্ডীর প্রাণ গলিয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—"মা, ত্রিভুবনে কেহই যাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না, তাহার আশ্রয় স্থান এই গঙ্গা-গর্ভ ভিন্ন কোথায় হইবে?"

সুভদ্রা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আপনি কি জন্য কাহার নিকটে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন?"

"আমার প্রিয়তমা এই অশ্বিনীটি রক্ষার জন্য, পৃথিবীর সকলের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছি, দেবতা মণ্ডলীরও দ্বারস্থ হইয়াছি; কিন্তু কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না।" এই কথা বলিয়া দণ্ডী কাঁদিতে লাগিলেন।

সুভদ্রা দণ্ডীকে শান্ত করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আপনি অশ্বিনীকে লইয়া এমন কি বিপন্ন হইয়াছেন, যে স্বর্গ মর্ত্তে কেহই আপনাকে আশ্রয় দিলেন না?"

দণ্ডী পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—মা কৃষ্ণ আমার এই অশ্বিনীটিকে বল পূর্ব্বক

গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতে পারি—এমন শক্তি আমার নাই। তাই একে একে ভারতের রাজগণের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছি, কেহই আমাকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবগণও পশ্চাৎপদ হইলেন। পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে—দেবতাগণ নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ভুলিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণও আশ্রিত বাৎসল্যকে আর ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না। যে ক্ষত্রিয়রাজ ঔশিনর শিবি—নিজের দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়া একটি কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলেন—সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজ আজ লুপ্ত হইয়াছেন!” সুভদ্রা বিস্ময়ের সহিত দণ্ডীরাজের কথা শুনিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন—“পাণ্ডবদের নিকট গিয়াছিলেন কি?” দণ্ডীরাজ কাতর ভাবে বলিলেন, “না মা, সেখানে যাইয়া কি ফল

ফলিবে? কৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবগণ কি তাঁহাদের সখার বিরুদ্ধে কখনও আমাকে আশ্রয় দিবেন? বরং বলবান পাণ্ডবের নিকট প্রস্তাব করিবা মাত্র, তাঁহারা আমায় বন্দী করিয়া অশ্বিনী সহ কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবেন। মা, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, তুমি আমার মৃত্যুতে বাধা দিওনা।”

পাণ্ডবগণ দণ্ডীরাজকে নিরাশ করেন নাই, ইহা ভাবিয়া সুভদ্রার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন পরের প্রিয় বস্তুতে দাদার এইরূপ লোভ জন্মিবার কারণ কি? দাদা ধর্ম্মের আশ্রয়, কোন দিন এমন অধর্ম্ম জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি যখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত, তখন নিশ্চয়ই ইহাতে কোন গূঢ় রহস্য আছে। আসিবার সময় আমাকে উপদেশ দিয়াছেন—‘তোমরাও নিরাশ্রয় কে আশ্রয় দিতে ভুলিওনা।’ আমি দাদার উপদেশ রক্ষা করিব—নিরাশ্রয় দণ্ডীকে আশ্রয় দিব। আশ্রিত রক্ষার জন্য যদি দাদার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ

করিতে হয় তাহাও করিব।” এইরূপ ভাবিয়া সুভদ্রা গলদশ্রু লোচনে—করযোড়ে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—“দাদা নিরাশ্রয় দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া তোমার বিরুদ্ধাচারী হইলাম। ইহার পরিণাম তুমিই জান। ইহার ফলাফল তোমার চরণে অর্পিত। প্রভু তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়।”

তখন স্নেহপূর্ণ স্বরে দণ্ডীরাজকে বলিলেন, “তুমি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ। মা কখনও কোন অবস্থায় সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম, আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে কেহ তোমাকে কি তোমার প্রিয়তমা অশ্বিনীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

এই কথা শুনিয়া দণ্ডীরাজ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। করযোড়ে বলিলেন “মা, আপনি দেবী না মানবী ?”

"দণ্ডীরাজ বিস্মিত হইবেন না, পৃথিবী এখনও ক্ষত্রিয়শূন্য হয় নাই। ক্ষত্রিয় রমণী এখনও বাহুবলশূন্য হন নাই, এখনও তাঁহারা আশ্রিতবাৎসল্যরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুলেন নাই। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসুন।" সুভদ্রা এই বলিয়া, দণ্ডীরাজকে, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া, তাঁহাদের রথের সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন। স্তম্ভিত দণ্ডীরাজ এক পদও নড়িলেন না। করযোড়ে কাতর নয়নে সুভদ্রার দিকে চাহিয়া যেন তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

"দণ্ডীরাজ, তোমার শত্রু—শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী—ভুবন বিজয়ী অর্জ্জুনের পত্নী—অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রাই আজ তোমার আশ্রয় দাত্রী।" সুভদ্রা এই কথা বলিয়া দণ্ডীরাজাকে আরও বিস্মিত করিলেন।

সুভদ্রার বাক্য ভঙ্গিতে দণ্ডীরাজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সুভদ্রার সঙ্গে যাইতে

সাহস পাইতেছেন না, অস্বীকারও করিতে পারিতেছেন না। তখন যাইবেন কি থাকিবেন এই ভাবনায় ব্যস্ত হইলেন। সুভদ্রা অভিমন্যুকে ডাকিলেন। অভিমন্যু উত্তরার সহিত অদূরে রথের উপর ছিলেন। অভিমন্যু মাতৃচরণে প্রণাম করিলে, সুভদ্রা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন— "আজ আমাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন, আজ এই গঙ্গাতীরে শপথ করিয়াছি—শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে আশ্রিত দণ্ডীরাজকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিব না। এই অশ্বিনীসহ দণ্ডীরাজের ভার তোমার উপর নির্দ্দেশ করিলাম। আমি আদেশ করিতে পারি,—তুমি ভিন্ন এমন কে আছে? স্বামী অদ্বিতীয় বীর, আমি তাঁহার সেবিকা,—তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতে পারি; সে প্রার্থনা পূর্ণ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা। পুত্রই মাতার একমাত্র আদেশের পাত্র। আমার বিশ্বাস পুত্র কখনও মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করেনা।"

অভিমন্যু তখন গঙ্গাতীরে মাতার-চরণ স্পর্শ

করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে এই অশ্বিনী কি দণ্ডী রাজের কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" দণ্ডীরাজ, অভিমন্যুর মুখের দিকে, বিস্ময়ে চাহিলেন। সুভদ্রা অভিমন্যুর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"বৎস, প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে শুন,—কাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে হইবে। যিনি এত দিন তোমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন, শস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিজের সমকক্ষ করিয়াছেন,—সেই চিরউপাস্য-গুরু—গোবিন্দের বিরুদ্ধে! পাণ্ডবগণও যদি তাঁহাদের সখার পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমন করেন তবে তাঁহাদেরও বিরুদ্ধে!"

মাতার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া অভিমন্যু, বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সুভদ্রা ধীর, স্থির, গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন "আরও শুন—পৃথিবীর কোন রাজা দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে সাহস পান নাই এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ,

এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও আশ্রয় দেন নাই। আমি আশ্রয় দিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহারা যুদ্ধ করেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে হইবে।"

তখন অভিমন্যু অকম্পিত স্বরে বলিলেন—"মা, অধিক আর কি বলিব, সমস্ত পৃথিবী সমবেত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও, তোমার পুত্র জীবন থাকিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না।" এই বলিয়া মাতার চরণ ধূলি পুনর্ব্বার মাথায় লইলেন এবং দণ্ডীরাজাকে অভয় দিয়া সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। দণ্ডী রাজও মন্ত্রমুগ্ধবৎ অশ্বিনীসহ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

পাণ্ডব-গৌরব।
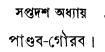
সুভদ্রা দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া উত্তরার সহিত পাণ্ডবদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দ্রৌপদীর পদধূলি লইয়া দণ্ডীরাজাকে আশ্রয় দান বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "তোমার দাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইহা পাণ্ডবদের পক্ষে অসম্ভব।" সুভদ্রা বলিলেন—"কৃষ্ণ আমার দাদা—আমি পারিলে কি পাণ্ডবগণ পারিবেন না?"

দ্রৌপদী বলিলেন—"তোমাদের সকলই অদ্ভুত। যেমন দাদা—তেমনই তাহার ভগ্নীটি! যাহা করিবেন তাহা যেমন বিচিত্র তেমনই অলৌকিক। তোমাদের মহিমা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই।"

দ্রৌপদী তখন ভীমসেনকে সংবাদ দিলেন।

সুভদ্রা কর্ত্তৃক দণ্ডী রাজের আশ্রয় দান বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। তিনিও কৃষ্ণ বিরুদ্ধে কৃষ্ণ-ভগ্নীর যুদ্ধ ঘোষণা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।
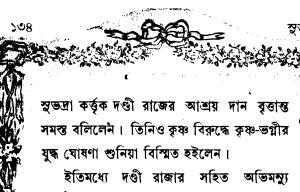
ইতিমধ্যে দণ্ডী রাজার সহিত অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়া, অশ্বিনী সহ দণ্ডী রাজের থাকিবার জন্য সুরক্ষিত স্থান চাহিলেন। অভিমন্যুর মুখে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা শুনিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিচলিত হইলেন। সুভদ্রার ব্যবহারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা এখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন করিতে ব্যস্ত আছেন। এই যুদ্ধে কৃষ্ণই একমাত্র বল ভরসা— এখন তাঁহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ?

সুভদ্রার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য যুধিষ্ঠির সহ অর্জ্জুন অন্তঃপুরে গেলেন। সুভদ্রার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যাঁহাকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ, তুমি কোন সাহসে তাঁহাকে আশ্রয় দিলে ?"

সুভদ্রা বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী—পাণ্ডব-কুলবধূ—মধ্যম পাণ্ডবের পত্নী—অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা কখনও ক্ষাত্রধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে পারে না। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আমি তাহাই করিয়াছি। এই ধর্ম্মযুদ্ধে দাদা শ্রীকৃষ্ণ কেন,—সমস্ত পৃথিবী সমবেত হইলেও, সুভদ্রা পশ্চাৎপদ হইবে না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সম্মুখে ভীষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত, এ সময়ে আমাদের একমাত্র ভরসা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা স্থাপন করা কি কর্ত্তব্য ?"

সুভদ্রা দেখিলেন ধর্ম্মরাজেরও মতিবিভ্রম ঘটিয়াছে, তিনি ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজ্যলোভে অধিকতর লুব্ধ হইয়াছেন। বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমি আপনাদিগকে, আপনাদের সখার বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করিতে বলিতেছি না। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অশ্বিনীসহ দণ্ডীকে রাখিবার জন্য একটুকু সুরক্ষিত স্থান প্রদান করুন এবং দূরে দাঁড়াইয়া দেখুন,—আমরা মাতা পুত্রে গঙ্গাতীরে যাঁহাকে

আশ্রয়দান করিয়াছি, কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করি—যিনি 'আমাদের অস্ত্র শিক্ষার গুরু, কিরূপে তাঁহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত করি। নিশ্চয় জানিবেন—ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ত্রিভূবন একত্রিত হইলেও জয়লাভ করিতে পারিবে না। আমি অতিবিনীত ভাবে ইহাও বলিতেছি—কৃষ্ণ ধর্ম্ম-আশ্রিত, স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিলে কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না।"

সুভদ্রার কথা শুনিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি একাকী দণ্ডীকে রক্ষা করিব।" অর্জ্জুন ছল ছল নেত্রে যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"হাঁ মা সত্যই বলিয়াছ—কৃষ্ণ ধর্ম্মের আশ্রিত, স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিলে, কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। তুমি আমাদের কুললক্ষ্মী, তুমি যে ভাবে কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়াছ, আমরা এখনও সে ভাবে চিনিতে পারি নাই, মা আজ তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে। আমারও

প্রতিজ্ঞা—পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল না হইলে কেহ দণ্ডীরাজের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

তখন যুদ্ধের আয়োজন হইল। কুরুকুল পাণ্ডবদের সহিত যোগদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে সমবেত পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। দেবগণসহ মহাদেব পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ভগবতী পাণ্ডব বিনাশে খড়গ হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অষ্টবজ্র সম্মিলিত হইল। অশ্বিনী শাপ মুক্ত হইয়া উর্ব্বসী মূর্ত্তি ধরিলেন। সুভদ্রা শ্বেতপতাকা হস্তে উভয় দলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বিনীর মুক্তি ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। সমস্ত দেবগণ পাণ্ডবদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধে ত্রিজগতে তাঁহাদের অতুল গৌরব রহিয়া গেল। কৃষ্ণ সহাস্যবদনে পাণ্ডবদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, ভগ্নীর গৌরবে নিজেও গৌরবান্বিত হইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা।
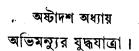
কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তৃত প্রান্তরে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডব সৈন্য সমবেত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গ, কেহ পাণ্ডব পক্ষে, কেহ দুর্য্যোধনের পক্ষে, সসৈন্যে যোগ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মন স্তুষ্টির জন্য, একদিকে তাঁহার নারায়ণী সেনা রাখিয়া ও অপর দিকে নিজে নিরস্ত্র থাকিয়া কহিলেন যাহার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। দুর্যোধন মহাহর্ষে যমোপম নারায়ণী সেনা লইলেন এবং অর্জ্জুন ভক্তিভরে নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নিজ রথের সারথি করিলেন।

উভয়পক্ষের সৈন্য সমবেত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্য ভাগে স্থাপন করিলেন। অর্জ্জুন চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—কুরু পাণ্ডবদের রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতের অসংখ্য রাজা ও সৈন্য

জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তখন তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি বিষাদে মলিন হইলেন। কাতর বচনে করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "সখে, এত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, বধ করিয়া যে রাজ্য লাভ করিতে হয়, আমি সে রাজ্য চাহি না।"

শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধের প্রারম্ভেই অর্জ্জুনের এইরূপ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া, চিন্তিত হইলেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের প্রত্যেক সন্দেহাত্মক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূরীভূত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশাবলী সঙ্কলন করিয়া বেদব্যাস "গীতা" নামে ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচার করি-লেন। ইহাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছে।

সুভদ্রা ও অভিমন্যু গীতার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া, কি কুরু, কি পাণ্ডব, উভয় পক্ষীয় সেনা-পতি হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলকে ধর্ম্ম যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

দশ দিন যুদ্ধের পর কুরুপক্ষের সেনাপতি ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। সুভদ্রা ও অভিমন্যু তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত। সুভদ্রা তাঁহার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতেছেন, অভিমন্যু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত গীতার উপদেশাবলী শ্রবণ করাইয়া চরিতার্থ করিতেছেন।

এমন সময়ে যুধিষ্ঠিরের দূত আসিয়া অভিমন্যুকে সংবাদ দিলেন—কুরুসেনাপতি দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছেন। স্বয়ং অর্জ্জুন সংসপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত। পাণ্ডব পক্ষে আপনি ভিন্ন চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানেন, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এই জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি পদে বরণ করিয়া, এই রাজমুকুট ও দিব্য অস্ত্র পাঠাইয়াছেন।

ষোড়শবর্ষবয়স্ক বালক, অপ্রত্যাশিত সেনাপতির পদে বরিত হইবার কথা শুনিয়াই, শর শয্যা শায়িত ভীষ্মদেবের পাদমূলে প্রণত

হইলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহ-আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। তৎপর অভিমন্যু মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন পুত্রের গৌরবে গৌরবিনী মাতা সুভদ্রা, পিতামহের নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক—পুত্রকে যুদ্ধ সাজে সাজাইবার জন্য, দূতের নিকট হইতে রাজমুকুট ও দিব্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, অভিমন্যুর শিবিরে গমন করিলেন।

অভিমন্যু স্বীয় শিবিরে আসিয়া দেখেন—উত্তরা মলিন বদনে বসিয়া আছেন। তিনি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন—সাতটা বাঘ এককালে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিয়াছে। সেই অবধি তাঁহার অশ্রুপাতের বিরাম নাই। কত বলিয়া কহিয়া আজ অভিমন্যুর যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে বরণের কথা শুনিয়া, তাঁহার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়াছে।

অভিমন্যু উত্তরাকে দেখিয়াই বলিলেন—

"উত্তরা আজ তোমার পরম সৌভাগ্য। মহারাজ আজ আমাকে পাণ্ডব সৈন্যের সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছেন। বল দেখি কাহার স্বামী এত অল্পবয়সে এমন গৌরবজনক পদ লাভ করিয়াছে?"

উত্তরা অভিমন্যুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি সে সৌভাগ্য চাহি না। আজ কিছুতেই তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না। আজই বুঝিবা আমার সৌভাগ্যের শেষ দিন—আজ যুদ্ধে গমনে ক্ষান্ত দাও।"

অভিমন্যু সস্নেহে উত্তরাকে উঠাইয়া, তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, তোমার কি, এ দৌর্ব্বল্য শোভা পায়? তোমার কথায় যুদ্ধে যাইব না ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ যখন সেনাপতি করিয়াছেন, তখন তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করি কেমন করিয়া? অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ পাইতেছে। কেহই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে

পারিতেছেন না। আমি যুদ্ধক্ষম হইয়া এ দৃশ্য শিবিরে বসিয়া কিরূপে দেখিব? আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া, পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধের সুবিধা করিয়া দিয়া, তোমার নিকট চলিয়া আসিব। তুমি ততক্ষণ মায়ের নিকট থাকিয়া গীতার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া শান্তি লাভ কর।”

তখন রাজমুকুট ও দিব্য অস্ত্রের সহিত সুভদ্রা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন। উত্তরা তাঁহার পায়ে পড়িয়া, অভিমন্যুকে অদ্যকার যুদ্ধে গমনের নিষেধ জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গত রাত্রের স্বপ্নের বিবরণ ও বলিলেন।

সুভদ্রা সস্নেহে উত্তরাকে উঠাইয়া বলিলেন —“মা সকলই ভগবানের হাত। কেহই নিয়তির বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি নিয়তি সেই রূপই হয়, তবে তুমি অভিকে শিবিরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেও তোমার স্বপ্নে দৃষ্ট সপ্তব্যাঘ্রের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

আর যদি নিয়তি প্রসন্ন থাকেন, তবে সপ্ত কেন—সমস্ত কুরুসৈন্য সমবেত যুদ্ধ করিয়াও, আমার বাছার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি হৃষ্টচিত্তে কুমারের যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন কর। সব অস্ত্র শস্ত্র আনিয়া দাও। আমি নিজ হাতে কুমারকে যুদ্ধ সাজে সাজাইয়া দিতেছি।"

সুভদ্রার নির্দ্দেশ অনুসারে উত্তরা বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনু প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আনিতে লাগিলেন। সুভদ্রা একে একে সমস্ত পরাইলেন। পরে মঙ্গল ঘট স্থাপন পূর্ব্বক কুমারকে বিদায় দিলেন। বলিলেন "বৎস অভি, মনে রাখিও—তুমি জগতের অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের পুত্র—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় ও শিষ্য—আর আমি তোমার মা—তোমাকে আদেশ করিতেছি, মহারাজ যে কার্য্য সাধন করিতে অদ্য এই আশাতীত গৌরবজনক পদে বরণ করিয়াছেন, সেই কার্য্য সাধন না করিয়া, প্রাণ থাকিতে শিবিরে ফিরিও না। যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া

পিতার নামে, মাতুল গোবিন্দের নামে, কলঙ্ক লেপন করিও না।" সুভদ্রা এই বলিয়া অভিমন্যুর শিরস্ত্রাণ লইয়া বিদায় দিলেন। করযোড়ে সজল নয়নে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন —"দাদা, আজ প্রাণের ধন অভিকে, তোমার পদে অর্পণ করিলাম, তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়।"

এই বলিয়া, সুভদ্রা উত্তরার সহিত নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া উত্তরাকে শান্ত করিতে লাগিলেন এবং নিজেও শান্তি লাভের চেষ্টা করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পুত্রশোক।

আজ কুরুশিবিরে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অভিমন্যুর অলৌকিক বীরত্বে, কুরুসৈন্য নিঃশেষ হইবার উপক্রম দেখিয়া, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সপ্ত মহারথী, একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিল।

কিন্তু সেই সমবেত সপ্ত-শক্তিও, বালক অভিমন্যুর নিকট সপ্তবার পরাজিত হইল। যখন অভিমন্যু নিরস্ত্র, অবিরাম যুদ্ধে অবসন্ন, তাঁহার সাহায্যার্থ, একজন পাণ্ডব সৈন্যও প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন অবসন্ন সিংহশাবককে অসংখ্য কুরুসৈন্য একত্রিত হইয়া বিনাশ করিল। সন্ধ্যাসমাগমে কুরুসৈন্যের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

এদিকে সংসপ্তক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, জয়-ধ্বনির সহিত অর্জ্জুন শিবিরে ফিরিতেছিলেন। উভয় পক্ষে জয়ধ্বনি শুনিয়া সকলেই বিস্মিত। অর্জ্জুন শিবিরে প্রবেশের পূর্ব্বেই, অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ পাণ্ডব শিবিরে আসিয়াছিল। আজ কেহই অর্জ্জুনকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত অভ্যর্থনা করিতেছে না। সকলেই যেন শোক-সাগরে মৃয়মাণ। অর্জ্জুনের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিনীত ভাবে ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যুর যুদ্ধ যাত্রার কথা অবগত

ছিলেন। তিনিই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন— "অভিমন্যুই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, তাহাকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। অর্জ্জুনের সংসপ্তক যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন—আজ অভিমন্যুকে বধ করিয়াই কুরুগণের এত জয়ধ্বনি।

পিতামহকে শরশয্যায় পাতিত করিয়া—পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অবসাদ জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। অর্জ্জুন যাহাতে পুত্রশোকে কাতর না হইয়া—পুত্র হন্তাদের প্রতিশোধ দানে প্রবৃত্ত হন, সেই ভাবে উত্তেজিত করিতে প্রস্তুত হইলেন। রথ ফিরাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে অভিমন্যুর মৃত দেহ আছে—সেই খানে লইয়া গেলেন। দেখিলেন —অভিমন্যুর মৃতদেহ কোলে লইয়া, সুভদ্রা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। উত্তরা, পতির পদতলে মূর্চ্ছিতা।

কৃষ্ণার্জ্জুনকে দেখিয়া, সুভদ্রার শোকাবেগ

উথলিয়া উঠিল। দরবিগলিত ধারায়, অশ্রু, গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণার্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই, সুভদ্রা অভিমন্যুকে কোলে করিয়া, নরনারায়ণের পদ প্রান্তে স্থাপন করত বলিলেন,—"দাদা আজ অভাগিণীর চির বাঞ্ছিত ধন তোমার চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।" এই বলিয়া একবার অর্জ্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যুর মৃতদেহ দেখিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, "বাবা অভি" "বাবা অভি" বলিতে বলিতে, ছিন্নমূলতরুর ন্যায় পড়িয়া গেলেন। মৃতদেহ বক্ষে করিয়া, আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হইলেন। শোক সাগর যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সুখে, দুঃখে, নির্ব্বিকার শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন—ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুকে বিনাশ করিতে পারে—কুরুপক্ষে এমন বীর নাই। কে, কি উপায়ে অভিকে বধ করিয়াছে, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

তখন ভগ্নদূত, একে একে অভিমন্যুর অতুল বীরত্বের কথা বলিতে লাগিল—সকলে শোক সন্তাপ ভুলিয়া গিয়া, সেই বীরত্ব-কাহিনী-রূপ অমৃতরাশি পান করিতে লাগিলেন। যখন সপ্তমহারথীর সম্মিলিত আক্রমণ ও তাহাদিগের সপ্তবার পরাজয়ের কথা শুনিলেন, তখন অৰ্জ্জুন, অভিকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ধন্য অভি, তুমি জগতে অতুল কীৰ্ত্তি রাখিয়া গেলে। এই সপ্তমহারথীর সমবেত আক্রমণ হইতে, বোধ হয় আত্মরক্ষার শক্তি জগতে কাহারও নাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"কি অধৰ্ম্ম? কি অধৰ্ম্ম? ক্ষত্রিয়ে কি এই রূপ অধৰ্ম্ম-যুদ্ধ করিতে পারে?" দূত বলিল "অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন কুমার যখন অস্ত্র শস্ত্রশূন্যহইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াছিলেন, তখন লুক্কাইত-সপ্তরথী একত্রে মিলিয়া, তাঁহাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া নিধন করিয়াছে। হায়, এই ভীষণ যুদ্ধে, কুমারের সাহায্য করিবার জন্য, পাণ্ডব পক্ষে একজন সেনানীও ছিলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—"ধিক্, ধিক্, যাহারা এইরূপ নিরস্ত্র, নিঃসহায় শিশুকে বিনাশ করে, তাহাদের জীবনে ধিক্, তাহারা বীরের কলঙ্ক—পৃথিবীর আবর্জ্জনা—তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করাই উচিত।"

অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের কথায় যোগ দিয়া বলিলেন "সত্য, এইরূপ বীর-কলঙ্ক দিগকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিতেই হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "সাধু, সাধু, তোমার মত বীরের, পুত্র শোকে কাতর না হইয়া, পুত্রহন্তাদের প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর হওয়াই উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতেই, অর্জ্জুন উৎসাহের সহিত, পুত্রহন্তাদের বিনাশসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন, ক্রমে জয়দ্রথ, দ্রোণ, কর্ণ, প্রভৃতির বিনাশ সাধন করিলেন। ভীম, দুর্য্যোধনাদি নিরানব্বই ভ্রাতার বিনাশ সাধন করিলেন। কেবল
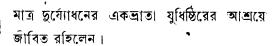
মাত্র দুর্য্যোধনের একভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে জীবিত রহিলেন।

এইরূপ, অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে, উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য বিনাশ পাইল। পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ, কুরুপক্ষে সাত্যকি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনের এক ভ্রাতা, এই দশজন জীবিত রহিলেন।

যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভারতের একছত্র সম্রাট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সুসাশনে ভারতের সকলেই সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায়

লীলাবসান।

যুদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শান্তিগীতার বর্ণনা করিয়া পুত্র-শোকাতুরা সুভদ্রার প্রাণে শান্তি আনিলেন। সুভদ্রাও, শান্তিগীতার ব্যাখ্যা করিয়া, পুত্রহীনার

পুত্রশোক, ভ্রাতৃহীনার ভ্রাতৃশোক, পতিহীনার পতিশোক ভুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তিনি যে, কেবলই শান্তিগীতার ব্যাখ্যা করিয়াই সকলকে শান্তি দেন, এমন নহে। সন্তানহীনাকে “মা” ডাকিয়া, সন্তানের মত সেবা শুশ্রূষায় তাহার তুষ্টি বিধান করেন। যাহার যে অভাব, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, প্রাণপণে তাহার প্রতিবিধান করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—সুভদ্রা পুত্র শোক ভুলিয়াছেন, তখন তিনি দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, একদিকে যেমন ধর্ম্মরাজ্যের চির শান্তির আভাস পাইয়া প্রফুল্ল হইতেছেন, অন্যদিকে তেমনি যাদবগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে, ভয়ঙ্কর অশান্তির আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—অসংখ্য যাদব জীবিত থাকিলে, ধর্ম্মরাজ্যে অশান্তির আবির্ভাব হইতে পারে। যাদবদের মধ্যে মদিরার প্রচলন হইয়াছে। বিলাস বৈভবে সকলেই মত্ত। আত্ম-সুখ সাধনের জন্য
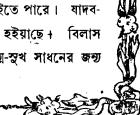
পরস্পরে আত্মকলহ চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া আকুল। কোন উপায়েই যদুবংশে শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন,—দুর্ব্বাসার অভিশাপে যদুবংশের ধ্বংসই অনিবার্য্য। সেই জন্য তিনি প্রভাসে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্ত ভারতে যজ্ঞের ঘোষণা হইল। কৃষ্ণ-ভক্তগণ একে একে প্রভাসে সমবেত হইলেন। কৃষ্ণগুণ গানে, অনন্ত আকাশ, অসীম সমুদ্র, উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণবলরাম ভক্তসঙ্গে নৃত্যগীতে বিভোর রহিলেন। যাদবগণের কথা ভাবিবার অবসর রহিল না।

এদিকে, যাদবগণ নানা প্রকার বিভৎস কার্য্যে রত হইলেন। মদমত্ত অবস্থায়, পরস্পর আত্ম-কলহে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যদুবংশ ধ্বংস হইতে লাগিল।

বলরাম, যদুবংশের দুরাবস্থা দর্শনে, ব্যথিত হৃদয়ে দেহ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, সমুদ্র

কুলে উপবেশন করিলে, তাঁহার নাসিকা হইতে এক অজগর বাহির হইয়া অনন্তফণা বিস্তারপূর্ব্বক সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ, দাদার শোকে ব্যথিত হইয়া, নিম্ব বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। এক ব্যাধ, মৃগভ্রমে তাঁহার পদে বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অবসান হইল।

অর্জ্জুন ও সুভদ্রা, প্রভাসযজ্ঞের সংবাদ পাইয়াই, দ্বারকায় আসিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা বশতঃ, আসিতে তাঁহাদের কালবিলম্ব ঘটিল। তাঁহারা পথে পথে, কত অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গানে বিভোর হইয়া পথে চলিতেছেন—তাঁহাদের পথ শেষ হইতেছে না। সুভদ্রা ও অর্জ্জুন, তাঁহাদের কৃষ্ণগুণ গানে বিমুগ্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছেন না। কত যাত্রী, পথশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, পথপ্রান্তে পড়িয়া, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন।

সুভদ্রা, দেখিবামাত্রেই, তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেছেন। অর্জ্জুন জল অন্বেষণে ছুটিতেছেন। জলদানে তাঁহাদের শান্তি বিধান করিতেছেন। এইরূপে, পথে পথে, তাঁহাদের অনেক বিলম্ব ঘটিল। যখন তাঁহারা প্রভাসের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন দেখিলেন—প্রভাসের যাত্রীগণ, কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে ফিরিতেছেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলেন, প্রভাসযজ্ঞ শেষ হইয়াছে—যদু বংশ ধ্বংস হইয়াছে। বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে প্রভাস ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং ধ্যানস্থ রহিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া ভদ্রার্জ্জুন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। প্রভাসে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে উভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। যাদবগণের স্তূপীকৃত মৃত দেহ দেখিয়া, তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। অনন্তনাগ-ভূষিত অনন্তদেবের দেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ধ্যানস্থ শ্রীকৃষ্ণের

উদ্দেশে ছুটিলেন। দেখিলেন—তিনি প্রাণ শূন্য। সুভদ্রা এ দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

সুভদ্রা আর এ শোকভার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অর্জ্জুনের চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন—“প্রভু আমার সব গেল। দাদারা গেলেন—তাঁহাদের চিহ্নও গেল। একান্ত বাসনা ছিল—আমার ত্রিদেবতা—কৃষ্ণ, বলরাম ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তি, একাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের পূজা জগতে প্রচার করিব। আমার সে বাসনা যেন পূর্ণ হয়। আমার ত্রিদেবতার দারুমূর্ত্তি, এমন স্থানে স্থাপন করিও, যেন ভারতের সমস্ত নরনারী তাঁহাদের পূজা করিয়া চরিতার্থ হয়। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।” সুভদ্রা অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিয়া, উত্তরের অপেক্ষা রহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন “সুভদ্রা, আ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, কিন্তু আমি ঞ বলরামের সঙ্গে একাসনে স্থান পা বার উপযুক্ত নহি। আমি দুই দেবভ্রাতার মধ্য

স্থলে, তাঁহাদের প্রাণের ভগিনী দেবী সুভদ্রার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সেবা করিব।" অর্জ্জুনের কথা শেষ হইতে না হইতেই, সুভদ্রা, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইলেন। তাঁহারও লীলা অবসান হইল।

অর্জ্জুন শোকসন্তপ্ত চিত্তে, পবিত্র নিম্ববৃক্ষ ছেদন করিয়া, শিল্পীসাহায্যে কৃষ্ণবলরাম ও সুভদ্রার মুর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন। ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তবাসীগণ, তখনও কৃষ্ণভক্তির স্বাদ পান নাই। তাই তিনি ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে, সমুদ্র তীরস্থ পুরীধামে, এই ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক, আজও সেই কৃষ্ণ-বলরাম সহ, সুভদ্রার পূজা করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত

শিশুপাঠ্য সচিত্র পুস্তক সমূহ।

খোকাখুকুদের জন্য

১। খোকাবাবুর ক খ ৶০

২। খুকুরাণীর খেলা ।/০

বালকবালিকা ও যুবকযুবতীর জন্য

সতী-কথা গ্রন্থাবলী

৩। সীতা ।৵০

৪। চিন্তা[illegible] ।৵০

৫। দময়[illegible] ।৵০

৬। সতী ।৵০